কার্তিকের কুয়াশা

টরন্টো, সেপ্টেম্বর ২৫, ২০১১ নভো সংখ্যা ২

সম্পাদক মন্ডলী:	পাঠক পরিষদ:
হাফিজ আহমেদ	হুমায়রা হারুন
সাগর জামান	
সাইদুজ্জামান / চঞ্চল জামান	সাইদুজ্জামান/ চঞ্চল জামান
ফিরোজা হারুন	সাগর জামান
সাইফুজ্জামান	লিমা জামান

সম্পাদকীয়
পাঠক পরিষদের কথা
কবিতা
ছোট গল্প
রম্য রচনা
প্রবন্ধ
মুক্ত গদ্য
ধারাবাহিক
কল্প বিজ্ঞান
শিশুতোষ
ই-বুক
আর্কাইভ
লেখক পরিচিতি
যোগাযোগ
হোমপেজ

সম্পাদকীয়
পাঠক পরিষদের কথা
কবিতা
ছোট গল্প
রম্য রচনা
প্রবন্ধ
মুক্ত গদ্য
ধারাবাহিক
কল্প বিজ্ঞান
শিশুতোষ
ই-বুক
আর্কাইভ
লেখক পরিচিতি
যোগাযোগ
হোমপেজ

সম্পাদকের ডেস্ক থেকে

কার্তিকের কুয়াশায় ‘প্রবন্ধ’ নামে গোটা একটি পাতা থাকা সত্ত্বেও ‘মুক্ত গদ্য’ নামে নূতন একটি পাতা সংযোজিত হলো। এ সংযোজন নিছক শ্রেণীভুক্তকরণের বাহুল্যতা নয়, বরং কালের দাবি থেকে উঠে আসা ভাবতেই বেশি ভালো লাগছে । গদ্যের মুক্তি ? কিসের থেকে এই মুক্তি? পদ্যের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস আমাদের প্রায় সবারই জানা, গদ্যের এমনধারা মুক্তির কথা তো এক অর্থে এই প্রথম ।

Vers Libre বা Free Verse বা মুক্ত ছন্দ বিষয়ে অসংখ্য নিবন্ধ আছে বাংলায়ও । তরুণ কবিদের জন্য অপরিহার্য এমন এক গ্রন্থ শঙ্খ ঘোষের “ছন্দের বারান্দা”। মুক্ত ছন্দ কাব্যকলার এমন একটি রূপ যা পূর্বাপর একই রকম ছন্দ:স্পন্দ, অন্তমিল বা লয়ের আদর্শ কোনো রীতি থেকে বিরত থাকে । শঙ্খ ঘোষ তাঁর ছন্দের বারান্দা বইতে লিখেছেন, “ ‘মুক্তি’ কথাটা অবশ্য একটু গোলমেলে। কিসের থেকে মুক্তি? ছন্দ থেকেই? অর্থাৎ পদ্য থেকে গদ্যে পৌঁছনো? বাংলা কবিতা কখনো কখনো সেই মুক্তি চেয়েছে ঠিকই। পদ্যছন্দকে কখনো কখনো আমরা ভেবেছি জীবন-মুখিতার পথে মস্ত বাধা । ভেবেছি যে , কবিতাকে সত্যে এবং ব্যাপ্তিতে পৌঁছে দেবার জন্য খুলে দেওয়া চাই এই বাধা , পদ্যছন্দের ঘর থেকে তাকে এনে দেওয়া চাই একেবারে গদ্যছন্দের পথে । ভেবেছি, এর ই নাম হলো মুক্তি । কিন্তু কেবল এটুকুই নয় । হয়তো আরো এরকম প্রচ্ছন্ন মুক্তি সম্ভব । ছন্দ থেকে নয়; ছন্দের মধ্যেই আছে সেই মুক্তি : ঘর আর পথের মাঝখানে যেন এক খোলা বারান্দা আছে কোথাও। কখনো –বা চলে আসা যায় সেই বারান্দায়, ছন্দের বন্ধনের মধ্যে থেকেই কখনো কখনো ভেঙ্গে দেওয়া যায় তার শুকনো নিয়ম, মিটিয়ে নেওয়া যায় গদ্যপদ্যের পরোক্ষ বিরোধ । এক হিসেবে, আধুনিক ছন্দের ইতিহাস হলো এই বিরোধমীমাংসারই ইতিহাস।”

তবে মুক্ত গদ্য নিয়ে আমি ব্যক্তিগতভাবে নিদারুন দ্বিধান্বিত । কিসের এই দ্বিধা? এ প্রশ্নের সরল কোনো উত্তর আমার মনে এখনো ঠিক জন্মে ওঠেনি। এ মুক্তি নিছক সাধু থেকে চলিতে আসার মুক্তি নিশ্চয় নয় । ‘মুক্ত গদ্য’ আমার কাছে যেন এক কিশোরের প্রথম বারের মতো হাতে পাওয়া এক অবৈধ অস্ত্রের মতো এখনো, আত্মরক্ষা নাকি অপরাধ জগতে প্রবেশের জন্য এই অস্ত্র তা যেন ঠিক এখনো নির্ধারিত নয়। এ মুক্তি কাঠামোগত নাকি শুধুই একটি আলাদা বিশেষ বিষয়ের হাতে স্বাধীনতার সনদপত্র সমর্পণ? বিশ্বসাহিত্যে বাংলা সাহিত্যই কি আজ এ মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দিচ্ছে?

সমালোচনা নয় বরং স্বাগত জানানোই এখানে অভিপ্রায় । বাংলা বানানে কতিপয় অক্ষরের আধুনিক মুক্তিকেও আমরা ইতিপূর্বে সানন্দে স্বাগত জানিয়েছি । বিবর্তনের ইতিহাস - প্রবর্তন, বিভাজন এবং বহুমুখীতা বা বৈচিত্র্যের ইতিহাস। মুক্ত বানানে বা মুক্ত গদ্যে আমাদের কোনো আপত্তি নেই । তবে যে খেলাটি খেলতে যাচ্ছি তার নিয়ম না জেনে যেমন খেলা যায় না, তেমনি একটি সাধারণ গদ্য রচনাকে কি কারণে মুক্ত গদ্য বলছি তা না জানলে গ্রহণযোগ্যতার জল ঘোলা হবে, রহস্যের কুয়াশা ঘনীভূত হবে, সৃষ্টি থেকে যাবে দৃষ্টিক্ষেত্রের বাইরে। পরিবর্তনের প্রবর্তনকে বিবর্তন পর্যন্ত পৌঁছুতে অভিনব কৌশলটিকে হতেই হবে নিরবচ্ছিন্ন, নিয়ম ভাঙ্গার অনিয়মে নয় বরং সুনির্দিষ্ট নিয়মেই ।

চঞ্চল জামান
টরন্টো, ক্যানাডা, ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০১১
editor@kartiker-kuasha.nauba-aloke-bangla.com

Share on Facebook

সম্পাদকীয়
পাঠক পরিষদের কথা
কবিতা
ছোট গল্প
রম্য রচনা
প্রবন্ধ
মুক্ত গদ্য
ধারাবাহিক
কল্প বিজ্ঞান
শিশুতোষ
ই-বুক
আর্কাইভ
লেখক পরিচিতি
যোগাযোগ
হোমপেজ

পাঠক পরিষদের কথা
(১)

প্রকাশের জন্য প্রদত্ত পান্ডুলিপি পড়ে মতামত দেওয়ার জন্য সম্পাদক কর্তৃক নিযুক্ত হয়েছেন চার সদস্যের পাঠক পরিষদ। প্রদত্ত পান্ডুলিপিটি পাঠক পরিষদের অন্তত একজন সদস্যের মতে প্রকাশযোগ্য বিবেচিত হলে তা সম্পাদকের দপ্তরে পাঠানো হবে। সম্পাদক তার গ্রহণযোগ্যতা বিচার করবেন।

সাহিত্য কি?

সাহিত্য এমন একটি পেশা যেখানে ভাষা এবং সমাজ বিজ্ঞানের বিদ্যালব্ধ জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও অনুশীলন ব্যবহৃত হয় মানবাত্মার সামগ্রিক কল্যাণ সাধণের জন্য। এই কর্ম পদ্ধতি বিবিধ পন্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে বিবিধ প্রযুক্তির মাধ্যমে বিচারান্তে পরিশীলিত এবং পরিশুদ্ধ হয়। একজন ভাষাবিজ্ঞানী এবং একজন সাহিত্যিকের মধ্যে মূল পার্থক্য হলো একজন আবিষ্কার করেন , অন্যজন তা ব্যবহার করেন। দুজনের মধ্যে একটা নীরব সহযোগীতা থাকে - তার অবর্তমানে ভাষার অধঃগতি প্রাপ্তি হয়।

সাহিত্যে কলুষ নিরোধ বলতে কি বোঝায়?

খাবার জলে যেমন ধাতু প্রাবল্য অনভিপ্রেত সাহিত্যে সেরকম ভাষা ও বিষের অপব্যবহার অনাকাঙ্খিত। খাবার জলে অসংখ্য কলুষ পদার্থের আধিক্য যেমন খাবার জলকে ব্যবহারের অনুপযুক্ত করে তোলে সেরকম স্থুল ভাষা এবং অশালীন বিষয়ও সাহিত্যকে বিষাক্ত করে তোলে। প্রসঙ্গত প্রশ্ন আসে বিষাক্ততার সংজ্ঞার্থ কি? এই বিশ্বে এমন কি আছে যা বিষ নয়? বিষাক্ততা আসলে মাত্রা নির্ভর। এই মাত্রা নির্ণীত হয় জনস্বাস্থ্যের নিরিখে ও সচেতন জনমতের বিচারে। অনুরূপভাবে সাহিত্যে শালীনতা নির্ণীত হয় একটি মাত্রার সাপেক্ষে। এই মাত্রার বিচারক অবশ্যই নির্ম্মল হৃদয় পাঠক।

সাহিত্যে পেশাদারিত্ব

পেশা এমন একটি পদস্থান যেখানে অন্ততপক্ষে কলা অথবা বিজ্ঞানে প্রাগ্রসর শিক্ষা আবশ্যক। যেখানে কায়িক নয় বরং মানসিক শ্রমই প্রয়োজনীয়। এই সংজ্ঞা, পেশার তালিকা থেকে বর্জন করেছে ক্রীড়াবিদ, পুলিশ, দমকল কর্মী, রাজনীতিবিদ, অভিনেতা এবং সৈন্যদের। পেশাদারিত্ব হতে পারে বিদ্যালব্ধ বা অন্যথা অর্জিত। বিদ্যালব্ধ পেশাদারিত্ব তালিকাভুক্ত করেছে চিকিৎসা, আইন এবং ধর্মতত্ত্ব। ১৭০৯ সন অব্দি সাহিত্য পেশাদারিত্বের মর্যদা না পেলেও অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রথম এ মর্যাদা মেলে। সাহিত্য , শিক্ষকতা, এবং এঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যালব্ধ পেশা না হলেও পেশা।
তবে সত্যিকার পেশাদার হওয়া একটি পেশায় নিয়োজিত থাকাই শুধু নয়। সত্যিকার পেশাদার তারাই যারা শিক্ষালব্ধ কলা অনুশীলন করেন জনসেবার তাগিদে।

সত্যিকার পেশাকে সংজ্ঞাবদ্ধ করা যেতে পারে সাতটি বৈশিষ্ট্য দিয়েঃ

১। পেশাগত সিদ্ধান্ত রচিত হবে সেইসব সাধারণ বিধি , তত্ত্ব অথবা প্রস্তাবনার মাধ্যমে যা একটি নির্দিষ্ট বিবেচনাধীন ঘটনা নির্ভর নয়।
২। পেশাগত সিদ্ধান্ত সূচিত করবে পেশাদারের একটিই নির্দিষ্ট মন্ডলের জ্ঞান, যে অঙ্গনে ঐ ব্যক্তি পারদর্শী। একজন পেশাদার তার নিজের পেশায়ই শুধু পারদর্শী এবং তিনি সব বিষয়ে পারদর্শী নন।
৩। পৃষ্ঠপোষকবৃন্দের সাথে পেশাদারের সম্বন্ধ উদ্দেশ্যমূলক এবং তা বিশেষ কোন আবেগ নির্ভর নয়।
৪। জন্মসূত্র, বর্ণ,ধর্ম, লিঙ্গ, বয়স অথবা সমিতির সদস্যপদ নির্বিশেষে একজন পেশাদার তার মর্যাদা এবং তার আর্থিক পুরস্কার অর্জন করবেন তার পারদর্শিতার মাধ্যমে।
৫। একজন পেশাদারের সিদ্ধান্ত অনুমিত হবে তার পৃষ্ঠপোষকবৃন্দের প্রতিনিধি স্বরূপ এবং তা হতে হবে নিঃস্বার্থ।
৬। একজন পেশাদার সম্বন্ধ স্থাপন করেন পেশাদারবৃন্দের সমিতির সঙ্গে। তিনি সেইসব সহকর্মীদের কর্তৃত্ব বা নির্দেশ তখনই গ্রহন করবেন যখন তার ভুলের কারণে সঠিক ভাবে কর্ম সম্পাদনে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন।
৭। একজন পেশাদার তিনিই যে তার খরিদ্দারের (সাহিত্যের ক্ষেত্রে পাঠক) অথবা পৃষ্ঠপোষকবৃন্দের ভাল মন্দ বোঝেন তাদের নিজেদের থেকেও বেশী।

সাহিত্যে প্রতিষেধ

সাহিত্যে প্রতিষেধ অতএব প্রধানত সুস্থ চিন্তা এবং ব্যবহার নির্ভর। নিরাপদ, রুচিসম্মত গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধ পাঠকের হাতে পৌঁছে দেয়া জরুরী। একজন সত্যিকার সাহিত্যিক তার লেখার পাঠযোগ্যতা সম্বন্ধে ধারণা রাখেন একজন পাঠকের চেয়ে বেশী। পাঠের অযোগ্য লেখা পাঠক পড়ছে বলেই লেখক লিখতে পারেন না। কারণ তা হবে পাঠককে বিভ্রান্ত করা। জেনেশুনে অন্যায় করা । স্বার্থপরতা করা। লেখক পাঠকের থেকে এক পা' আগেই চলবেন কারণ সাহিত্যের দ্বারা লোকশিক্ষা হয়, সমাজ বিবর্তন হয় আর হয় সুস্থ মনোরঞ্জন।

চঞ্চল জামান

অক্ষাংশ: ৩০.৪৩৮০৫৬৯৪৫৮
দ্রাঘিমা:-৮৪.২৮০৮৩০৩৮৩৩
৩১শে অগাস্ট,২০০৭

(২)

সময়ের সাথে সাথে সভ্যতার বিবর্তন ঘটে আর রূপান্তর ঘটে ভাষার। মনের ভাব প্রকাশের মাধ্যম হলো ভাষা। সুতরাং ভাষার বিবর্তন বলতে বুঝতে হবে ভাব প্রকাশেরও বিবর্তন যা কালক্রমে নিয়ে এসেছে জটিল থেকে সহজ সাবলীল প্রকাশভঙ্গীর উপস্থাপন। ভাষার ব্যবহার যত সাবলীল, তা মানুষের কাছে ততই গ্রহনযোগ্য। এই সাবলীলতার ব্যাপ্তি ঘটে তখনই যখন ভাষার শব্দভান্ডার হয়ে উঠে সমৃদ্ধিশালী। শব্দভান্ডারের প্রসার বিস্তৃত হয় যদি কিনা একটি ভাষা তার উৎপত্তি সময়কালের গন্ডী পেরিয়ে নতুন রূপ লাভ করে। বিদ্যাসাগর, সঞ্জীবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র থেকে রবীন্দ্রনাথ হয়ে নজরুল, জসীমুদ্দিন বা শরৎচন্দ্রের হাত ধরে কল্লোল যুগের পরিশোধনাগার থেকে যে ভাষা আমরা পেয়েছি তা আরও সাবলীল ও সহজবোধ্য হয়েছে। এর জন্য প্রয়োজন হয় একটি ভাষার সাথে অপর একটি ভাষার আদান প্রদান। তার মানে এই নয় যে নিজের ভাষার শব্দসমূহ বাদ দিয়ে শুধু অপর ভাষার শব্দসমূহকে স্বাগত জানানো। বরং অন্য একটি সমৃদ্ধ ভাষার শব্দগুলো বা তার শব্দার্থ বা সেই ভাষার ভাবার্থ প্রয়োগের কৌশলগুলো নিজের ভাষায় অন্তর্ভুক্ত করে নিজস্ব ভাষায় বহুমাত্রিক ব্দশৈলীর উপস্থাপন ঘটানো। যে এতে যত বেশী পারঙ্গম হবেন, তার ভাষাও হবে তত শ্রুতিমধুর। আর এই শ্রুতিমধুরতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন নিজ ভাষার ওপর যথাযথ জ্ঞান, পাশাপাশি অন্য ভাষাকে জানা এবং তা থেকে সুন্দরতম শব্দ ও ভাবার্থ প্রয়োগের কৌশলগত জ্ঞান লব্ধ করা। ফরাসী, জার্মান, রুশ বা যেকোন ভাষায় যদি বাংলা সাহিত্যের চর্চাকে ব্যাপকভাবে তুলে ধরা যায়, তাহলে দেখা যাবে বাংলাভাষার ছন্দময় শব্দশৈলীর প্রয়োগ উক্ত বিদেশী ভাষাগুলোকে আকৃষ্ট করেছে। কালক্রমে ঐসকল ভাষার মাঝেও বাংলা লেখনীর স্টাইল খুঁজে পাওয়া যাবে। ঠিক উলটোটিও ঘটতে পারে বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে। এমনিতেই বাঙ্গলা ভাষা বিভিন্ন ভাষার প্রভাবধ্বনীত্বে উর্বর।
ভাষার বিবর্তন অপ্রতিরোধ্য। সাহিত্য চর্চার মাধ্যমে ভাষার অনুশীলন সময়ের প্রয়োজনে হয় অপরিহার্য। অনুশীলনে যদি ছেদ পড়ে তখন আবির্ভাব ঘটে স্থবিরতার। সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিকাশে স্থবিরতা ভাষার গতিশীলতাকে রুদ্ধ করে দেয়। সে কারণেই আজ সবিনয়ে এই আশাই ব্যক্ত করি যেন, স্থবিরতার দোষে আড়ষ্ট না হয়ে ভাষার ব্যবহারে পরিশীলিত ও সংবেদনশীল হয়ে সবাই যেন নিদ্রোত্থিত হয়ে ওঠে। সবাই হোক ভাষা চর্চায় শক্তিশালী, শব্দের খেলায় সমৃদ্ধ, অধিক গতিময়, তারও চেয়ে অধিক ছন্দময়।

হুমায়রা হারুন
অক্ষাংশ: ৫০.৯৪৩০০০৭৯৩৫
দ্রাঘিমা: ৬.৯৫৮৪১৯৭৯৯৮১
৩১ শে অগাস্ট, ২০০৭

Share on Facebook

সম্পাদকীয়
পাঠক পরিষদের কথা
কবিতা
ছোট গল্প
রম্য রচনা
প্রবন্ধ
মুক্ত গদ্য
ধারাবাহিক
কল্প বিজ্ঞান
শিশুতোষ
ই-বুক
আর্কাইভ
লেখক পরিচিতি
যোগাযোগ
হোমপেজ

প্রেম তুমি থেকো

আবদুল হাকিম
ক্লার্কস লেইন, বাল্টিমোর, ইউ এস এ

[কবিতাটিতে ঈ, ঊ, ণ, ং, শ –এ পাঁচটি অক্ষর ব্যবহার করা হয়নি]

অনামিকায় অঙ্গুরি।
তুমি থেকো।
কপোলে কুন্তলে মদির দৃষ্টি।
তুমি থেকো।
কবরিতে লটকে থাকা হঠাত,
বসন্তের আমের বোল।
তুমি থেকো।
সিসির ভেজা নিটোল পায়ে,
লুটিয়ে পড়া সাড়ির আচোল।
তুমি থেকো।
আমার আর হোলনা থাকা।
প্রেম। তুমি ভেবনা।
ওরাতো রইলো।

***

আকাশ

অরুণোদয় কুণ্ডু

হাওড়া , পশ্চিমবঙ্গ , ভারতবর্ষ

বারান্দা থেকে কিছুটা যায় দেখা ,
পুরোটা তো যায়না ;
তার ঝাপসা ছবি আছে আঁকা
মুখোমুখি যখন হয় আয়না ।
ঝাপসা থেকে অদৃশ্যের খোঁজে
তার প্রতিদিনের পথচলা ।
জানলায় আজ গরাদ লেগে গেছে ;
সপ্তর্ষি বইয়ের পাতায় ভোলা ।
মনের হাওয়ায় অক্সিজেন কম ;
চশমাটা আজ আলকাতরা মাখা ।
চাঁদ মামাও নিয়েছে অবসর ,
বিহঙ্গ আজ বন্ধ করেছে পাখা ।
গলা টিপে ধরছে এসে কংক্রিট জেলখানা ;
ফেরারী মন ব্যাস্ত খোঁজে একটা আস্তানা ।
যেথায় দুচোখ দেখবে শুধু আকাশ শামীয়ানা ।

***

বাইশে শ্রাবণ

বেদানুজ চক্রবর্তী
পশ্চিমবঙ্গ , ভারতবর্ষ

বাইশে শ্রাবণ কেন ফিরে ফিরে আসে, রবীন্দ্রনাথ ?
কেন নারীর মতন , জীবনের প্রতি দণ্ড পল জড়িয়ে জড়িয়ে রাখে ?
চলে যায়, দূরে দূরে চলে যায়..
আবার আগন্তুক নদী ; আবার ফিরে ফিরে আসে সেই বিষণ্ন সময়

আমি তো নীলকণ্ঠ নই তোমার মতন।

আমার শরীর জুড়ে বিষ পিঁপড়েরা খেলা করে;
সেই রাত মনে পড়ে যায় ..
আধেক ঘুমে শুনেছিলাম কার চাপা স্বর
কে যেন সরে গেল, চলে গেল চাঁদের আলোয়..
শান্তিনিকেতনেও , উত্তরায়ণের বারান্দায় জোব্বা পরা তোমার শিল্যুয়েত।
শমী চলে গেল।
সেদিন বৈতালিকে কান্না নয়, গান শুনে ছিলাম।
তুমি নূতনের গান গাও।
টিভি তে, সিডি তে, আকাশবানীতে,
জলে , স্থলে, অন্তরীক্ষে ।
আমি শুনি।
আমার শরীরে বিষ পিঁপড়েরা অনায়াস সংসার পাতে ।

এই তো ক’দিন আগে
চলে গেল মৃণালিনী, - ছুটি, তোমার সন্তানের জননী।
তোমার পত্রাবলী কি অনায়াস সংযমে
জানাচ্ছে সে কথা।
কি করে পারলে তুমি ? জীবন দেবতা ছিল বলে ?

সেই কি বর্ম হয়ে সহ্য করেছে যত দুঃখের অভিঘাত ?
বিচ্ছেদের শ্রাবণ ধারায় করেনি নমিত ?
আমি তো পারিনি।
বরং আমিতো জানি, পত্রাবলী বলেনি যে কথা-
বউঠাকুরানি , রানু, মিস ওকাম্পো ,
আর সেই মাদ্রাজ বাসিনী মেয়ে !
প্রথম চুম্বনে যার সিক্ত করেছিল ওষ্ঠ তোমার ?
তখন কোথায় ছিল জীবন দেবতা ?
বলে যাও, কি দিয়ে ঢেকেছ ক্ষত ?
সন্ধান দিয়ে যাও সেই শ্যামলিম ঘাস-
আমি তো পারিনা।
লক্ষ বিষ পিঁপড়ের জ্বালা-
নারী চলে গেলে।
চৌকাঠে লাশ ভাসে
একটা একটা রাত যায়, একটা একটা লাশ..
তুমি গান গাও;
নিকষেতে ফুটে ওঠে সোনার আখর খানি ।
আমি জানি।
বিরহ উপস্থিত সত্যের মতন।

দুঃখ তবু ফিরে আসে নাচার ভিক্ষুকের মতো
ফিরে ফিরে আসে শুধু বাইশে শ্রাবণ , নারী ।

***

নামাঙ্কিত

পার্থসারাথি ভৌমিক
কলকাতা, ভারত

জন্ম ওদের কাক-জ্যোৎস্না মাখা ।

তবু হাতের উড়ান স্বপ্নডানা আছে ।
কিম্বা মনন নিয়ে ছুটছে পায়ের হরিণ ।
কিম্বা ভ্রমর- কালো চোখের মণি ,- পরশ।
কিম্বা কোকিল আলোয় অধর ভাষার পাঠ।
কিম্বা জিভ-টা সরে আঁকার খাতায় তুলি ।
কিম্বা শিরদাঁড়া -টা সত্যসমেত ঋজু ।

মড়ার রক্তে বাঁচার কথা শিখেও-
তবু ওদের যদি প্রতিবন্ধী নাম
-তর্জনী তুই বিপ্রতীপ -এ ফের !

***

দূরত্ব

সাগর জামান

দূরত্ব থেকেই যায়
গাছেরা পুষ্প পাতায় সজ্জিত হয়
প্রেমিক প্রেমিকার নিবিড় নৈকট্যে
তরঙ্গিত জলে মাছেরা অবাধ খেলা করে
দূরত্ব ঘোচেনা তবুও
দূরত্ব থেকে যায়
আকাশে পুঞ্জ পুঞ্জ নীল আর সাদার আলিঙ্গনে
দূরত্ব শূণ্য প্রেম নেই
প্রেমের মধ্যে দূরত্ব আছে

Share on Facebook

ছোটগল্প

ছোটগল্প সাহিত্যের একটি শাখা (literary genre)। সাধারণত কল্পকাহিনীর বর্ণনামূলক গদ্য (fictional narrative prose) এবং উপন্যাসের (novel) তুলনায় অধিকতর সংক্ষিপ্ত এবং লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট। প্রথম ও শেষ অনুচ্ছেদে এই লক্ষ্যটির সুস্পষ্ট প্রকাশই একটি ছোটগল্পকে একাধিক পাঠের আয়ু দিতে পারে। প্রথম অনুচ্ছেদে বললাম কি বলতে চাই, গল্পের শরীরে সে অভিপ্রায় বর্ণিত হলো আর পরিশেষে কি বললাম তা সংক্ষেপে বলেই গল্প বলা শেষ করলাম।

-পাঠক পরিষদ

“বান্ধব”

-------লীমা জামান শিল্পী

সেই প্রতিবাদী দুঃসাহসী মেয়ে পলা আজ তিলতিল করে যে মানুষে পরিণত হয়েছে তা নিজের কাছেও অচেনা। পলা ভবিষ্যত দেখতে পেতো তবু কেন সমুদ্রে ঝাপিয়ে পড়লো কে জানে। সত্যি সে বদলে গ্যাছে। বাইরে থেকে হাসি আনন্দের যে চিত্র সবাই দেখে সেটা আসলে তার সুন্দর পরিপাটি খোলস। এর আড়ালে যন্ত্রনার বিভৎস রূপটি ঢাকা পড়ে আছে। বিশ্বাস করে যে ভূমিটি আঁকড়ে ধরেছিল সেটা ছিলো ভুলে ভরা চোরাবালি।

পলা সাতদিন আগেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিল। রিপোর্ট পজেটিভ। সমস্ত পেপারস্ রেডি করতে সপ্তা কেটে গেল। রাত প্রায় একটা বাজে। পাশে পাভেল ঘুমোচ্ছে। কি শান্ত নিষ্পাপ মুখ। চোখের সামনে বারবার টুকরো স্মৃতি ভেসে উঠলো। ফেলে আসা ছয় বছর আগের ছবি। একুশ বছরেও কাউকে নির্ভরযোগ্য মনে হয়নি। তখন ভেবেছে বাকীটা জীবন সুরের সাধনায় কেটে যাবে। এক বৈশাখে অবধারিত এমন ভাবে পলার জীবনে পাভেল নামের পুরুষ শান্তির বাক বাকুম বীনা বাজালো। এই বয়সে দূর্দান্ত প্রেমে ভাসতে লাগল পলা। কে জানতো ভাসতে ভাসতে জল খেতে খেতে শ্বাস রোধ হবে তার। আহ্ প্রচন্ড শ্বাস কষ্ট । চোখ মেলে দেখে পলা জানালা তো খোলাই আছে তবু অক্সিজেন কেন তাকে এড়িয়ে যাচ্ছে। পাশ ফিরে দেখে পাভেল ঠিক আগের মত ঘুমোচ্ছে। মনে পড়ে বিয়ের পর পালেভকে বলেছিল-

:এই আমি কিন্তু তাড়াতাড়ি মা হতে চাই।

:পড়াশুনার কি হবে?

:আর পড়বো না সোনাবাচ্চা!

:বেশী বাকী নেই তো।

:আল্লা তিন বছরের মানে বোঝো? তুমি ভাই এইসব বলতে আইসো না। বিয়ে করছি বাচ্চাকাচ্চা পালবো ব্যস। কিসের পড়া?

:আর গানের কি হবে?আর্শ্চয তো গায়িকাদের বাচ্চা হয়না নাকি ?

:ঠিক আছে তুমি যা ভালো মনে করো তাই করবা।

:থ্যাংক ইউ জানটুস।

:ফাঁকিবাজ।

:স্বামীর কাঁধে পা তুলে খেতেই বেশী ভাল্লাগে। জানো আমি মেয়ে চাই। মেয়ের নাম রাখবো তোমার নামের সাথে মিলিয়ে “পায়েল”।

:পাভেল হেসে বললো, আর ছেলে হলে ?

:ছেলে হবে না তো।

:তোমার কল্পনার দৌড় দেখে আমার ঘুম আসছে। আসো শুয়ে পড়ি।

:এই সারাদিন এতো ঘুমাস ক্যান।একটু ভালোবাসার কথা বলনা পাখি।

:কি শুনবা আমি তো বলতে পারিনা।

:বা- বা বিয়ের আগে তো ভালোই পারছো। ঢং করবা না বলো আই লাভ ইউ।

:বললাম।

:কই বললা ?

:আচ্ছা যাও আই লাভ ইউ, এখন ঘুমাও।

:আমিও তোমাকে আই লাভ ইউ!

প্রায় ভোর হয়ে এল। সব কাগজপত্রের সাথে একটা চিঠিও লিখে যেতে চায় পলা।

পাভেল,

আমার চলে যাওয়াতে তুমি অবাক হবে না জানি। তুমি সব কিছু খুব স্বাভাবিক ভাবে নিতে পারো। বিয়ের পনের দিন আগে তুমি যখন গয়নার ডিজাইন আর সবকিছু পছন্দ করার পর আমাকে তোমার মায়ের কাছে নিয়ে গেলে তখন আমি ছিলাম তোমাতে বিভোর। তোমার হাসপাতালে ডিউটি ছিল তাই আমাকে রেখে চলে গেলে। ঐদিন প্রথম তোমার মাকে পা ছুঁয়ে ছালাম করলাম। শ্রদ্ধায় মন ভরে গেল। রুচি আর শিক্ষার দীপ্ত মুর্তি। উঁনি বলেছিলেন আজ স্কুল থেকে ছুটি নিয়েছি তোমার গান শুনবো বলে। উনি আমাকে রান্নাঘরে ঢুকতে দিলেন না। চা হাতে কুলসুম ঢুকে জিগ্যেস করল খালা আম্মা এই আপা কে ? উত্তরে মা বলেছিলেন, এখন বলা যাবে না। পরে শুনবি। যা ওকে ও চা আর নাস্তা দে। দুপুর বারোটার দিকে বসে টিভির চ্যানেল বদলাচ্ছি আর তোমার ভদ্র সৌম্য মুখটা ভাবছি। কুলসুম ঘর মুছছিল জিগ্যেস করলাম তোমার নাম কি? লাজুক হেসে উত্তর দিল । আমি ওকে কুসুম বলে ডাকলাম । হঠাৎ খেয়াল করলাম ওর বুকের আঁচল ঘসে পড়েছে। খোলা বুকের অর্ধেকটা যেন ইট চাপা হলদে ঘাস সেখানে পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘের মত জমে আছে নীল রং রক্ত জমাট চুম্বন দাগ। জিগ্যেস করলাম, কুসুম তোমার বিয়ে হয়েছে কবে? লজ্জায় ওর শ্যামলা মুখটা যেন খয়েরী হয়ে গেল। ও শুধু হাসলো কিছুই বললো না। এদিকে আমিও অকারন লজ্জায় লাল নীল খয়েরি হলাম।

বিয়ের পর ওকে দেখিনি। দু'মাস পর হঠাৎ একদিন সকালে কুলসুম এসে হাজির। আমার পায়ে হাত দিয়ে ছালাম করতে গেছে আমি বাধা দিয়ে বললাম এই তুমি কে? বললো আপা আমি কুলসুম। কুসুম তোমাকে তো চিনতেই পারিনি। তুমি কি অসুস্থ?

ও আমাকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। ওকে শান্ত করার চেষ্টা করছি বললো, আপা আমার খুব বিপদ। বললাম, আমাকে খুলে বলো কোন চিন্তা করোনা।

:আপা আমি মরতে চাইছিলাম। বুড়া মা আর ছোট বোন মরতে দিল না।

:ক্যান মরতে চাও আমাকে বলো কোন ভয় নেই। কি বিপদ তোমার কুসুম?

:আপা গো আমি পুয়াতি আমারে বাঁচান।

ওর সর্বনাশের পিশাচকে আমি ঐ প্রথম চিনলাম। তার ছবিতে থুতু ছিটিয়ে অসংখ্যবার ঘৃনা করি বলেছিলাম।

আমার গয়না বেচে ওকে ক্লিনিকে নিয়ে এবরশান করালাম। ওর চিৎকার আমি শুনেছিলাম কিঙ' আমার চিৎকার কেউ শোনেনি। কারন আমার জন্য কেউ বাইরে অপেক্ষা করে ছিল না। কুলসুমকে বাড়ী পৌঁছে দেবার ৩দিন পর আমাকেও আমার চেতন অবচেতন তাড়িয়ে নিয়ে গেল সেই ক্লিনিকে। এ যুদ্ধ আমি একা করেছি। আমার যন্ত্রনার নীল মুখ আর অক্ষমতার লাল রক্ত শুধুই ডাক্তার দেখেছে বারবার । বারবার।

ধীরে ধীরে মন খারাপের ক্যান্সার আমাকে আঁকড়ে ধরলো। অগ্নিবলয়ের এপারে যেন কিছুতেই আসতে পারছিলাম না। আমার বদলে যাওয়া ক্লান্ত শরীর-মন তোমার মত বিচক্ষণ চিকিৎসকের চোখকে কি সত্যি এড়িয়ে গিয়েছিল? জানতে ইচ্ছে করে না। গত ছয় বছরে আমি ভিতু ব্যক্তিত্বহীন মিথ্যেবাদী অথর্ব মানুষে পরিণত হয়েছি। যখন দেখলাম অন্য এক ভূবনে চলে যাচ্ছি। তখন মনে হলো, না না সিজোফ্রেনিয়াকে সঙ্গী করে পথে পথে ঘুরবো না। সাত দিন আগে নিশ্চিত হলাম প্রেগনেন্সি পজেটিভ। এবার "ও" কে এবোলা ভাইরাস মনে হলো না। মনে হলোনা ও আমার সর্বস্ব গ্রাস করবে। উপলব্ধি করলাম স্বেচ্ছানির্বাসন থেকে মুক্তি চাই। পথে নামবো। কিন্তু আমি যে একা তাই ওকে সঙ্গে নিলাম। গন্তব্যহীন পথ চলবো বহুদূর। হাঁটতে হাটতে সমস্ত ক্লান্তি একদিন দুর হবেই। তোমাকে একদিন একমাত্র বন্ধু ভেবে ভুল করেছিলাম আজ তাই আমার সমস্ত গোপন কষ্ট তোমাকে জানিয়ে ছুটি নিলাম। "পলা"।

সকাল সকাল বেরিয়ে পড়লো পলা। তারপর পলার পথচলা। পলকের জন্ম । কিছু আর ভাবতে চায় না পলা। অথবা ভাবনা গুলো কাউকে বুঝাতে চায় না। সব অনুভূতির অনুবাদ হয় কি?

একদিন আট মাসের পলককে নিয়ে নিউ মার্কেটে গানের কিছু সিডি খুঁজছে পলা। দোকানের লোকটা ওকে তিনদিন ঘুরালো। পলা বেশ রেগে গিয়ে বললো, "আপনি খুঁজে পাবেন না তাহলে আমাকে আসতে বললেন কেন"? হঠাৎ দেখে কেউ একজন কম্পিউটার থেকে মুখ তুলে হাসছে। পলার দিকে তাকিয়ে বললো,

গানগুলো কি আপনার খুব দরকার?

:দরকার বলেইতো বাচ্চা নিয়ে তিন দিন এলাম।

:আমি বোধয় আপনাকে হেল্প করতে পারি।

:আপনার দোকানে আছে?

:জ্বী আছে।

দোকানের সব ছেলেরা হাসছে।

:আমি কবে পাবো?

:আপনাকে কষ্ট করে আসতে হবে না। ঠিকানা ফোন নাম্বার রেখে যান পাঠিয়ে দেবো।

দু'মাস পর লোকটার সাথে দেখা। ওকে দোকানদার ভেবেছিল বলে লজ্জা পেলো পলা। ও হঠাৎ বললো আপনি কি আমার বন্ধু হবেন? কথাটাও ইংরেজীতে বললো। কথাটার বাংলা কি পলার প্রশ্ন। ও একই কথা আবার বললো।

হাসলো পলা। বললো, আপনার হাতে এতোগুলো আংটি। এসব কি কি পাথর?

:আপনি কথা ঘুরাচ্ছেন।

:এরকম ফ্রেন্ডশীপ কতবার করেছেন?

:আপনি খুব প্রশ্ন করেন তাই না?

:প্রশ্নটা কি অবান্তর?

:আপনি হয়তো বিশ্বাস করবেন না আমি মেয়েদের সাথে মিশিনা।

:হঠাৎ আমার বন্ধুত্ব দরকার হলো কেন?

:জানি না কেন?

:নিজের দরকারটা জানেন না?

ও চুপ করে ছিলো। খুব ঠান্ডা গলায় পলা বললো, "আমি বন্ধুত্বে বিশ্বাসী না। মানে ছেলেতে মেয়েতে কখনো বন্ধুত্ব হয় না। যদি দুটো ইলেকট্রিক তার পাশাপাশি থাকে তবে দূর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা বেশী"। বলেই বুঝলো খুব বাজে হয়ে গেল উদাহরনটা। লোকটা বললো, "ওটা তারের বেলায়। ছেলেতে মেয়েতে বন্ধুত্ব হয়না এমন কিছু করেই তা ভুল প্রমাণ করবো"। পলার মাথায় দুষ্টুমী খেলে গেল। মনে ভাবলো ভেরী স্মার্ট।এই ছেলে আমাকে চ্যালেঞ্জ করছে?

:বাসায় যাবি না? কোথায় বাসা?

:আপনি আমাকে তুই করে বলছেন?

:বন্ধুকে কেউ আপনি বলে নাকি?

:কোথায় বাসা?

:বেইলী রোডে। আপনি কি জোর করেই আমাকে বন্ধু বানাবেন?

:ইয়েস্।

এই হলো তুহিন। বাসায় ফিরে শাওয়ার নিতে নিতে হঠাৎ পলার মনে পড়লো সেই ভয়ংকর বন্ধুর কথা। যে স্মৃতি সে ভুলে যেতে চেয়েছে বহুবার।

তখন ইন্টারমিডিয়েট সেকেন্ড ইয়ারে। ছেলেটা সম্পর্কে দুঃসম্পর্কের চাচা। পলার চেয়ে বছর তিনেকের বড়। চেহারায় সততার একটা ছাপ। প্রায়ই ফোন করতো। একদিন হুট করে বাসায় এসে পলার হাতে একটা রুপালী রাখী বেধে দিয়ে বললো আজ থেকে তুমি আমার "রাখীবন্ধু" ঠিক আছে? পলা মাথা নেড়ে বললো, ঠিক আছে।

সেই বন্ধু পলাকে রাখী বলে ডাকতো। ধীরে ধীরে রাখী নামটা ঢাকা পড়লো অন্য সব নামের আড়ালে। একদিন কলেজ থেকে বাসায় ফিরে বাথরুমে গোসল করছে পলা। গোসলের শেষ দিকে ওর মনে হলো কাঁচের জানালায় একটা ছায়া। ভালো করে তাকাতেই (রাখী বন্ধু?) চোখে চোখ পড়লো। ও সরে যেতেই বসে পড়লো পলা। সমস্ত শরীর অবশ হয়ে এলো। মনে হলো এ জীবনে বাথরুমে থেকে বের হতে পারবে না। কষ্টে যেন মরে গেল। জীবন্ত লাশ হয়ে সারাক্ষণ বিছানায় শুয়ে থাকে। নিজেকে ভিষণ অপবিত্র আর বেমানান মনে হয়

পৃথিবীতে। দুচোখ মরুভূমি। একদিন তপতী ম্যাডাম বাসায় এলেন। যিনি পলার ইংরেজী সাহিত্যের টিচার। ম্যাডাম প্রায়ই বলতেন, তুমি অনেক বড় গায়ক হবে। আজ ম্যাডামের চোখে মুখে প্রশ্নবোধক চিহ্ন।

:পলা গান পড়াশুনা কেন ছেড়ে দিলে? আমায় বলা যায় না?

সব কষ্টের ভার দিতে চেয়ে ম্যাডামকে জড়িয়ে ধরে পলা কান্নার সাগর বইয়ে দিল। তপতী ম্যাডাম বললেন, "চোখের চল নয়, প্রতিশোধ"!

তিনদিন পর ম্যাডাম ফোন করে পলাকে যেতে বললো। পলা গেল। ওর ব্যাসমেটরা খুব খুশী হলো। পলা বিব্রত বোধ করলো। ঐদিন পড়া হলো না। ম্যাডাম সব মেয়েদের ভেতরের রুমে যেতে বললো এবং কে কে তার আদেশ পালন করতে রাজী জিগ্যেস করলো।সবাই একসাথে হাত তুললো। পলা দূর্বল পায়ে ম্যাডামকে অনুসরন করলো। ঘরে ঢুকে দেখলো কেউ একজন ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে আছে। পলা ঘুরে দাঁড়াতেই ম্যাডাম খুব কঠিন গলায় বললো, "মেয়েরা শোন তোমাদের সামনে একজন শয়তান দাঁড়িয়ে, তোমরা একে একে ওর মুখে থুতু দাও!" মেয়েরা সানন্দে লাইন ধরে দাঁড়িয়ে থাকা শয়তানের মুখে থুথু ছিটালো। ম্যাডাম ভয়ংকর ভাষায় ওটাকে বেরিয়ে যেতে বললো। পলা চোখে ঝাপসা দেখলো। ম্যাডাম অন্যদেরকে ছুটি দিল। পলা দাঁড়িয়ে কিছু মনে করার চেষ্টা করছে। মনে পড়ছে না। চোখের সামনে শুধু ম্যাডামের অসম্ভব সুন্দর কালো মুখটা ভেসে উঠলো। কালো কখনো এতো সুন্দর হয়! ম্যাডামের কালোর আলোয় পলার সব কুয়াশা কেটে গেল। ভাবলো ম্যাডামের সিঁথিতে লাল রেখাটা কেন যে নেই! যদি থাকতো তবে কি অসহ্য সুন্দরই না লাগতো।

তপতী ম্যাডাম বলেছিল, "পলা পড়াশুনায় মন দাও। সব ঠিক হয়ে যাবে। মনে রেখো নারীর শরীর এক পবিত্র গ্রন্থ । কোন পাপী এসে যদি সেটা ছুঁয়ে দেয় তাতে গ্রন্থের কোন অসম্মান হয় না"।

তুহিনের সাথে দেখা হয় কথা হয়। পলা ভাবে তুহিন কি সত্যিই বন্ধু হয়ে গেল।

একদিন তুহিনকে বললো, চল রিক্সায় ঘুরি। বুঝলো তুহিনের ইচ্ছে নেই। রেগে গিয়ে বললো, "আমার সাথে রিক্সায় বসলে কি তোর সতিত্ব নষ্ট হয়ে যাবে"? তুহিন বাধ্য হয়ে রিক্সা নিল। পলা বললো "হুড তোল আমার সমস্যা হবে"। তুহিন বিরক্ত হয়ে হুড তুললো। কথা বলতে বলতে উদ্দেশ্যহীন ঘুরছে। হঠাৎ তুহিন পলার ওড়না ঠিক করে দিলো। প্রথমে পাত্তা দিলো না পলা। কিছুক্ষণ পর একই কাজ করলো তুহিন। পলার মাথায় খুন চড়ে গেল। বললো, তুহিন রিক্সা থামা। তুহিন রিক্সা থামিয়ে নেমে গেল। পলক ওর কোলেই আছে। পলা বুঝতে পারছে না তুহিন এতো ঘামছে কেন? পলা বললো,

:নিজে ফ্যাশন করলে কোন দোষ নেই আমি করলেই দোষ?

:ভুল জায়গায় ওড়না রাখাটা ফ্যাশন নাকি?

:ভুল সঠিক তোর কাছ থেকে শিখতে হবে? তুহিন তুই তোর আমার সম্পর্কের সীমানা অতিক্রম করতেছিস। তোর গার্জেনগিরি অসহ্য লাগে। তোকে চোদ্দবার হজ্জ করতে কে বলছে? হিপোক্রেসি অসহ্য লাগে।

:তোর সাথে আগে দেখা হলে হজ্জ করতাম না।

:মানে?

:হজ্জ করাটা তোর কাছে হিপোক্রেসি তাই।

একদিন তুহিনের হাত খালি দেখে পলা জিগ্যেস করলো,

:অঙ্গুঠী কোথায়?

:খুলে রেখেছি।

:ক্যান?

:তুই তো পছন্দ করিস না। বলিস আংটি পরলে নাকি আমাকে ব্যাপারি ব্যাপারি লাগে।

:ওহ তুহিন! তোর নিজস্বতা বলে কিছু নেই? অন্যের পছন্দে নিজেকে ক্যান পাল্টাবি? নিজের মত হওয়ার চেষ্টা কর বুঝলি?

:পলকের খিদে পেয়েছে চল কোথাও খাই।

ওরা খুব সাধারন একটা হোটেলে ভাত খেলো। পলা বললো- "তুহিনরে তোকে তো সিগারেট খেলে দারুন লাগে"। তুহিন ভিষণ রোমান্টিক চোখে তাকালো পলার দিকে নয় সিগারেটের দিকে।

পলা মনে মনে বলে- "ঈশ্বর তুহিন যেন কোনদিন আমাকে ভালোবাসার কথা না বলে। ওকে অপমান করে কষ্ট দিতে চাই না"।

তুহিন খুব অসহায় চোখে আকাশ দেখছে।

:তোর কি মন খারাপ তুহিন? আয় একটা খেলা খেলি।

:কি খেলা?

:চোখে চোখ রাখা খেলা। তুই আমার চোখের দিকে তাকাবি আমি তোর চোখে। পলক পড়তে পারবে না।

:তোর চোখে চোখ রাখা খেলা আমি খেলবো না।

:আমার চোখে সমস্যা কি ?

:খেলবো না ব্যস।

:তোর ফালতু মুড আমার ভালো লাগে না। খেলতেই হবে। তাকা নে শুরু কর। যে জিতবে সে একটা গান গাবে।

:কি গান?

পলা হাসতে হাসতে গাইল- "পড়েনা চোখের পলক কি তোমার রুপের ঝলক" হেসে ফেললো তুহিন। বললো

:তুই গান জানিস?

:গান কে না জানে? তুইতো গানও কম্পেজ করছিস। মডেলিংও করছিস। অলরাউন্ডার হবার ইচ্ছে ছিল?

তুহিন খুব গম্ভীর হয়ে বললো,

:এতো সেজেছিস কেন?

:তোকে ইমপ্রেস করার জন্যে না, নিজের জন্যে।

:তোকে না সাজলেই বেশী সুন্দর লাগে।

:সুন্দর না লাগলে কি হয়?

:সুন্দর লাগলেও কিছু হয় না।

পলা বললো একটা গল্প শুনবি? "একটা মেয়ে প্রতিদিন খুব যত্ন করে সাজে স্বামীর দৃষ্টি কাড়ার জন্যে। স্বামী ফিরেও তাকায় না হঠাৎ একদিন স্বামীর চোখ পড়লো। স্বামী হাসি মুখে বেচারা মেয়েটির কাছে গিয়ে বললো, "আরে আজ তোমাকে পরস্ত্রীর মত লাগছে"! তুহিন বিরক্ত হয়ে বললো

:এটা আবার কেমন গল্প?

:বুঝলি না পুরুষের চোখে পরস্ত্রী সব সময় সুন্দর।

:এসব ফালতু গল্প আমাকে শুনাবি না।

:শুনাবো না যা।

তুহিনের মুরব্বী ভাবটা পলার অসহ্য লাগে। ওকে দেখে মনে হয় দশ বছরের বড় অথচ তুহিন পলার চেয়ে আট বছরের ছোট।

:তুহিন একটা বুদ্ধি দেতো। কিভাবে চেহারার খুকী ভাবটা দূর করা যায়? মানে কি করলে চেহারায় বয়স ফুটে উঠবে 'চশমা পড়বো' ?

:মেয়েরা নাকি বয়স কমাতে চায় তুই বাড়াবি কেন?

:কারন আমি সো কল্ড মেয়ে না। বল বল তাড়াতাড়ি বল!

:হেয়ার স্টাইল চেঞ্জ করে ফেল । ফোবি ক্যাটস থেকে মাধুরী হয়ে যা।

:মানে কি?

:মানে চুল বড় কর। কাটা চুলগুলো ক্লীপ দিয়ে আটকে রাখ। আর টিপ পড়বি।

:টিপ পড়বো কি কারনে?

:টিপের সাথে বিয়ের একটা সম্পর্ক আছে।

:তুমি বেশী পন্ডিত। মেয়েরা বুঝি বিয়ের আগে টিপ পড়ে না? জলজ্যান্ত বাচ্চা নিয়ে ঘুরছি ..... তুই সত্যি আজব।

তুহিনের কথা মতো ক'দিন শাড়ী চুড়ী টিপ পড়ে ঘুরলো পলা।

ফোন করলো তুহিনকে -

:তুহিন সাহেব আপনি ফেল্।

:কেন?

:তোর পরামর্শ কাজে লাগলো না। বেবীরা আমাকে বেবী ভেবে প্রেম পত্র লিখতেছে।

:বই মেলায় যাবি?

:উহ্ তুহিন যাবি? কতো বছর যে বই মেলায় যাইনি।

:কাল সকালে রেডি থাকিস।

রাতে তুহিন "শাড়ী" শব্দটা অসংখ্য বার লিখে পাঠালো। মেজাজ খারপ হলো পলার ।সে লিখলো "শাড়ী পড়ে নারী না সাজলে তোমার আর ভালো লাগছে না, না? আর কোনদিন শাড়ী পড়বো না। বই মেলায় আমি একাই যাবো। তুই থাকবি না"।

আজ সকালে পলা দেখলো বই মেলার সামনে তুহিন ঠিকই দাঁড়িয়ে আছে। পাশ কাটিয়ে বইয়ের দোকানে পলা মনে মনে হেলাল হাফিজের বই খুঁজছে যে বইটিতে সেই কবিতা আছে "কষ্ট নেবে? কষ্ট" পেয়েও গেল। "যে জলে আগুন জ্বলে"

:একটু শোন।

:কি বল।

:তোর তো খুব শরীর খারাপ । ইচ্ছে করে টেনশান করিস।

:হ্যা, ডেল কার্নেগী মুখ¯' করছি সব টেনশন শেষ হয়ে যাবে।

:তোর সাথে ভিষণ জরুরী কথা আছে।

:বল কি জরুরী কথা?

:হ্যা বলবো মাথা ঠান্ডা করে শুনবি। তোর শরীর দিন দিন খারাপ হয়ে যাচ্ছে। তুই ভিষন অসুস্থ হয়ে পড়ছিস। আয়নায় নিজেকে দেখিস না? এতো পরিশ্রম তোর সইছে না। তাছাড়া এভাবে সংসার চলে না।

:অন্য চাকরীর কথা বলছিস? নাকি বিজনেস? আচ্ছা তুই ইঞ্জিনিয়ার হয়ে ব্যবসায়ী হলি কেন? অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ার। বানা না একটা গাড়ী। মেড ইন বাংলাদেশ। কি বানাবি?

:একটু মনোযোগ আশা করতে পারি? কথাটা খুব জরুরী।

:তোর ভুমিকার ভনিতা দেখলে গা জ্বলে যায়। বলে ফ্যাল কি কথা? তোর এই এসেছি গিয়েছি মার্কা কথা শুনলেও মেজাজ খারাপ হয়।

:তাহলে যে এতো বানান ঠিক করে দিস?

:আর বানান ঠিক করবো না যা।

পলা এক সময় ভাবতো যে ভাষার জন্য এত রক্তপাত সেই ভাষাটা শুদ্ধ করে বলিনা কেন। এখন ভাবে মনের ইচ্ছে প্রকাশ করাটাই বড় ব্যাপার। পৃথিবীতে কতো কতো দেশ কত কত সব ভাষা কিন্তু মানুষ তো একই। অনুভূতি তো একই।

পলা ভাবেনি এতো বড় নাটক ওর জন্যে অপেক্ষা করছে। হঠাৎ তুহিন কিছু কাগজ পত্র বের করলো বললো, রেগে যাবি না খুব ঠান্ডা মাথায় এগুলো দ্যাখ।

:তুই বল কিসের কাগজ এগুলো আমি বুঝবো না। কি এসব?

:ক্যানাডায় যাবার কাগজ।

:তুহিন তুই আরো পড়বি? কবে যাচ্ছিস?

:সেটা তুই জানিস।

:আশ্চর্য তো যাবি তুই আর জানবো আমি?

:কারন আমার সাথে তুইও যাচ্ছিস।

:আমি যাবো? কিভাবে?

:তুই সেটা ভালো করে জানিস।

:তুহিন আমি বুঝতে পারছি না।

:তুই খুব ভালো করে বুঝতে পারছিস।

:মানে তোর বৌ হয়ে আমি যাবো কানাডায়? তুই কি পাগল হয়ে গেলি? এই দুঃস্বপ্ন তুই তিন বছর আগে দেখেছিস? এতবড় সিদ্ধান্ত তুই একা নিলি? তুহিন পলককে কোলে তুলে নিয়ে বললো আমি তোদের ভালোর জন্য করেছি তোর ভালো। পলকের ভালো ....

:পলকের ভালো চিন্তা করার তুই কে?

:শোন পলা এখনও সময় আছে ঘুরে দাঁড়া। এটা কোন জীবন নয়। আর একবার ভাব।

:আমার সব কিছু ভাবাই আছে। আমার হাত ছাড় তুহিন!

পলা কাঁপছে। বলছে, “যেতে হলে পলকের জন্মের আগেই যেতাম ...”!

:তার মানে তুই যাবিনা। তাহলে ঐ দুই রুম ছেড়ে অন্তত আমার ফ্ল্যাটে আয়।

:প্রশ্নই আসে না। তুই অনেক বড় ভুল করলি তুহিন। তুই একাই চলে যা। তোর মুখ কোনদিন েখতে চাই না।

:তুই আমার ফ্ল্যাটে আসবি কি না বল।

:না না এবং না।

তুহিন দ্রুতহাতে কাগজগুলো ছিঁড়ে টুকরো করলো।

মাথা ঘুরছে পলার। ভিষণ কান্না পেল। পড়ে যাচ্ছিল এমন সময় তুহিন ধরে ফেললো। ওদেরকে ট্যাক্সিতে তুলে দিল। বাসায় ফিরে ঘুমের ওসুধ খেলো। ঘুম তবু এলো না। গভীর রাতে ম্যাসেজ এলো “বউ খুব বেশী ভালোবাসী তোকে। চুমু তোর মনে”। পলা ক্লান্ত কণ্ঠে ফোন করে বললো

:তুই বাজিতে হেরে গেছিস তুহিন। তুই চ্যালেঞ্জ করেছিলি না? হিপোক্রাট....

লাইনটা হয়তো চিরদিনের জন্যে কেটে গেল। হয়তো আর কোনদিন তুহিন নিজেকে মেলে ধরবে না।

ধারনা ভুল প্রমান করে তিন মাস পর তুহিনের ফোন এলো। পলা সেলফোনটা সমস্ত শক্তি দিয়ে ছুঁড়ে ফেললো। এই বলে নিজেকে প্রবোধ দিল-

নারী তুমি আজন্ম একা। পথ চলতে চলতে পুরুষের ছায়ায় জিরোবার প্রয়োজন তোমার নেই। তুমি অন্তহীন একা তোমার চারপাশে গড়ে তোল কঠিন দেয়াল যাতে পুরুষ বান্ধব তোমাকে ছুঁতে না পারে।

- ২০০৬ -

Share on Facebook

নারীর কহতব্য

মূলঃ মিখাইল ঝভানেতস্কি
অনুবাদঃ সাইদুজ্জামান

সব কিছুই খুব সহজ হয়ে যায় যদি আপনি বুঝতে পারেন নারীর ভাষা।
• রমনী যাচ্ছে পাতাল রেলে। চুপচাপ। ডান হাতে আংটি । অর্থাৎ বিবাহিতা। অর্থাৎ সাবধান । অর্থাৎ দন্ডায়মান থাকুন পুরুষেরা স্ব স্ব স্থানে। স্থবির নিশ্চল।
• আংটি বাম হাতে। অর্থাৎ বিবাহ বিচ্যুত।
• দুটি আংটি বাম হাতে। অর্থাৎ দু দু'বার বিবাহ বিচ্ছেদ।
• আংটি বাম হাতে, আংটি ডান হাতে। অর্থাৎ দু' দু'বার বিবাহিতা। দ্বিতীয়বারে সফলতা অর্জন।
• আংটি ডান হাতে এবং দু'কানে দুল। অর্থাত বিবাহিতা, তবে মেনে নেয়া যাচ্ছেনা।
• দুটি আংটিই ডান হাতে এবং দু'কানে দুল। বিবাহিতা, তবে আছে আরো একজন। দু'জনেই বিবাহিত, একজন তার সাথেই। দু'জনেই স্ত্রীভাগ্যে হতভাগ্য।
• আংটি ডান হাতে, এককানে দুল, মোটের উপর বিবাহিতাই বলা যেতে পারে।
• আংটি ডান হাতে, আংটি বাম হাতে। দু'কানে দুল। ব্রোচ। কাজ করেন রেস্তোঁরায়।
• কালো চশমা, আংটি, শ্বেত পরচুলা, গলার শেকলে মস্ত ঘড়ি,পূর্ব নামের রেস্তোঁরায় বারে কাজ করেন। বর নেই, রুচি নেই, মনের মানুষ নেই। মদ্যপায়ী, খদ্যগ্রাসী, ধুম্রপায়ী,দন্ডায়মান অথবা শায়িত পুরুষ মানুষ গা গুলানো ঘৃণা সৃষ্টি করে। ত্রিকক্ষ-বিশাল বাসস্থান ঠিক শহরের কেন্দ্রে অবস্থিত। চারটি টেলিফোনে পুরুষেরা গেয়ে যায় জর্জিয়ান quartet. স্নানাগারে স্ফটিকের ঝালর আর হা করা ভালুকের মুখ থেকে প্রবাহমান উষ্ণ জলধারা এবং তারচেয়ে মেয়েলী দৈহিক কাঠামোর ন্যাকড়া হাতে এক পুরুষ।
• দুল বিহীন, জিন্স, ঝিনুকের মালা, নেকলেস, রূপোর শেকলে প্রাচীন আধূলি, কাঁধে ব্যাগ, দাঁতে কাটা নখ, রহস্যময়ী পা দু'খানি। ফ্যানাটিক শিল্পী। নিজের মধ্যে এতটাই নিমজ্জিত যে অন্য কেউ সেখানে আঁটবে না।
• ডায়ামন্ড, দীর্ঘ ঘাড়, খাড়া করে চুল আচঁড়ানো, পুষ্ট কাঁধ, দেহ ভঙ্গিমা, বিস্ময়কর পরিধান, শক্তিশালী পদযুগল। বালশোয় থিয়েটারের নর্তকী। কথা বলা অর্থহীন। আপনি পদব্রজে, আমি মার্সিডিজে, কথা হবে যদি দৌড়ে ধরতে পারেন।
• আংটি ডান হাতে, পরিপাটী চুল বাঁধা, কালো স্যুট, সাদা জামা, ফিল্টার বিহীন সিগ্রেট বেলামোর –আপনার কি চাই কমরেড?
• স্বর্ণালী পরিপাটী চুল, সবুজ উলের স্যুট, মার্জিত বাদামী জুতা এবং ধূসর নয়নযুগলের অতি সুন্দর চাহনীঃ তোর বউ, গর্দভ!

Share on Facebook

সম্পাদকীয়
পাঠক পরিষদের কথা
কবিতা
ছোট গল্প
রম্য রচনা
প্রবন্ধ
মুক্ত গদ্য
ধারাবাহিক
কল্প বিজ্ঞান
শিশুতোষ
ই-বুক
আর্কাইভ
লেখক পরিচিতি
যোগাযোগ
হোমপেজ

সম্পাদকীয়
পাঠক পরিষদের কথা
কবিতা
ছোট গল্প
রম্য রচনা
প্রবন্ধ
মুক্ত গদ্য
ধারাবাহিক
কল্প বিজ্ঞান
শিশুতোষ
ই-বুক
আর্কাইভ
লেখক পরিচিতি
যোগাযোগ
হোমপেজ

ঋজুচেতনার কবি মহাদেব সাহা

ড. সৌমিত্র শেখর,
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা, বাংলাদেশ

নবযৌবনকালে মহাদেব সাহার ‘আমি কি বলতে পেরেছিলাম’ কবিতা পড়ে নিজে এতোটাই সম্মোহিত হয়েছিলাম যে,সে প্রভাবে আমিও কিছু একটা লিখে ফেলেছিলাম। স্থানীয় এক সম্পাদক পনেরই আগস্ট উপলক্ষে সে লেখা ছেপেওছিলেন। উত্তরকালে তাঁর কবিতা আর একটু গভীরভাবে পড়ার সময় বুঝেছি,কবি হিসেবে তিনি উচ্চকণ্ঠ নন,তবে ঋজুচেতনাধারী আর তাই প্রভাব বিস্তারী। নরমভাবে কত শক্ত ভাব যে প্রকাশ করা যায়,কবি মহাদেব সাহা সেটা দেখিয়েছেন। উচ্চকণ্ঠ না হলেও কবিতার নীলকণ্ঠ এই মহাদেব;শতশোকেও অটল,দৃঢ়। সূচনা কিন্তু এভাবে হয় নি তাঁর। প্রথম কাব্যগ্রন্থ এই গৃহ এই সন্ন্যাস (১৯৭২) পাঠ করলে যে কবিকে চেনা যায়, তিনি অনেক বেশি আবেগপ্রবন,গভীর অনুভূতিতে আপ্লুত। এ কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতা ক্ষুধা। একটু পড়লেই বোঝা যায় এ ক্ষিদে জঠরের নয় -অন্য কিছুর। কী চমৎকার উপমা-উৎপ্রেক্ষা দিয়ে সূচনা করেছেন কবি!

‘আমার শরীরে চোখে হৃদয়ে কেবল জ্বলে ক্ষুধা,
ক্ষুধার দীর্ঘ গ্রীবা স্থবির জন্তুর মতো মেলে দেয় লোলুপতা, অভ্যন্তরে
হৃদযন্ত্রে,মস্তিষ্কের সেলে ক্ষুধার তীব্র নখ ভয়ঙ্কর জ্বলে
যেন এক সর্বাঙ্গে সহস্র চোখ মাছি ঘুরে ঘুরে আমার
চোখের ভিতর থেকে মাংস তুলে খায়,[...]’
[ক্ষুধা]

এ কাব্যগ্রন্থেই গৃহকে সন্ন্যাস ভেবে জীবনের পর্বান্তরে কাতর কবি। কিন্তু অল্প পরেই সেই চেতনা তাঁর দৃঢ়মূল হয়,যে চেতনা আমাদের স্বদেশ ও স্বাজাত্যবোধ থেকে জাগ্রত। মানুষই হয়ে ওঠে তাঁর কবিতার কেন্দ্রমূল। মহাদেব সাহার কাব্যগ্রন্থাবলির একটি তালিকা দেবার চেষ্টা করা যাকঃ এই গৃহ এই সন্ন্যাস (১৯৭২),মানব এসেছি কাছে (১৯৭৩),চাই বিষ অমরতা (১৯৭৫),কী সুন্দর অন্ধ (১৯৭৮),তোমার পায়ের শব্দ (১৯৮২), ধুলোমাটির মানুষ (১৯৮২),ফুল কই,শুধু অস্ত্রের উল্লাস (১৯৮৪),লাজুক লিরিক (১৯৮৪),আমি ছিন্নভিন্ন (১৯৮৬),মানুষ বড়ো ক্রন্দন জানে না (১৯৮৯),প্রথম পয়ার (১৯৯০),কোথা সেই প্রেম কোথা সেই বিদ্রোহ (১৯৯০),প্রেমের কবিতা (১৯৯১),রাজনৈতিক কবিতা (১৯৯১),অস্তমিত কালের গৌরব (১৯৯২),আমূল বদলে দাও আমার জীবন (১৯৯৩),একা হয়ে যাও (১৯৯৩),যদুবংশ ধ্বংসের আগে (১৯৯৪),কোথায় যাই,কার কাছে যাই (১৯৯৪),সুন্দরের হাতে আজ হাতকড়া গোলাপের বিরুদ্ধে হুলিয়া (১৯৯৫), এসো তুমি পুরাণের পাখি (১৯৯৫), বেঁচে আছি স্বপ্নমানুষ (১৯৯৫), বিষাদ ছুঁয়েছে আজ, মন ভালো নেই (১৯৯৬), আকাশের আদ্যোপান্ত (১৯৯৬), তোমার জন্য অন্ত্যমিল (১৯৯৬), ভুলি নাই তোমাকে রুমাল (১৯৯৬), তুমিই অনন্ত উৎস (১৯৯৬), কেউ ভালোবাসে না (১৯৯৭), কাকে এই মনের কথা বলি (১৯৯৭), অন্তহীন নৃত্যের মহড়া (১৯৯৭), একবার নিজের কাছে যাই (১৯৯৭), পাতার ঘোমটা-পরা বাড়ি (১৯৯৭), ভালোবাসা কেন এত আলো-অন্ধকারময় (২০০৫) ইত্যাদি।

মহাদেব সাহার কবিতার দুটো স্পষ্টভাগঃ রাজনীতি এবং প্রেম। রাজনৈতিক চেতনা, আদর্শ, মূল্যবোধ যা-ই বলা হোক না কেন, এ প্রসঙ্গে তিনি আপোষহীন। কিন্তু প্রেমে দৃঢ়তা নেই, সমর্পণেই প্রাপ্তিবোধ তাঁর। নারীকে তিনি বলেছেন ‘অধিকার’। বলেছেন এভাবেঃ ‘হেলানো গ্রীবায় ধরো ভুলো রাজহাঁস/ যে হও সে হও তুমি।’ এ নারীর কোনো নাম নেই, পরিচয় নেই, ধর্ম নেই; আছে শুধু প্রেম, পুরুষের অধিকার। নারী শিরোনামের কবিতায় নারীকে নিয়ে এ ধরনের বক্তব্যই প্রকাশ করেছেন কবি। কিন্তু জীবন সায়াহ্নে এসে সেই কবিই তাঁর প্রেয়সী নারীকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন কালের অমোঘ সত্যঃ

‘তুমি কোথাও আর খুঁজে পাবে না টিনের চালে বৃষ্টির নৃত্য,
মন-উদাস-করা ঘুঘুর ডাক
খুঁজে পাবে না তোমার সেই কল্লোলিত জীবন,সেই আলুলায়িত দিনরাত্রি
তুমি কোথাও আজ আর খুঁজে পাবে না তোমার সেই সুখ,
সেই দুঃখ, সেই ভালোবাসা, বিরহ।’
[কোথাও আর খুঁজে পাবে না]

ভালোবাসার এই কথকতা মিথ্যে নয় মহাদেবের কবিতায়। কবি প্রেম ও কামের পার্থক্য সদাস্পষ্ট রেখেছেন। তাঁর কবিতায় দেহগন্ধী শব্দরাজীর ব্যবহার থাকলেও তা অনেক পরিশীলিত,পাঠ বা শ্রবণের মাত্রা ছাড়িয়ে যায় না। যেমনঃ তিনি যখন লেখেন –

‘দূরে, আরো অতি দূরে যেতে যেতে সঙ্গমে সৎকারে নেমে
আরো এক বিশুদ্ধ মাটির মর্ম জেনে নিতে হবে। কী সে প্রতিমা
কী সে প্রতীক, তোমরা তাহারও বেশি উদ্দামতা পাবে।
না হলে এ নারী হবে উরুর অশ্লীল, কোনো মর্মগ্রাহী নয়
মাত্র গ্রীসের গণিকা, মেয়ে অধর্ম অশ্লীল।’
[যাও সঙ্গমে সৎকারে, প্রেমে]

লক্ষ্য করার বিষয়, এখানে সঙ্গম শব্দটি ব্যবহার করা হলেও তা যৌনতার ভাব প্রকাশের আগেই 'সৎকার' শব্দের অনুপ্রাসে হাওয়ায় মিলিয়ে যায়। ঠিক তেমনি,'উরুর অশ্লীল' এবং 'অধর্মেরঅশ্লীল'এর মধ্যে গ্রীসের গণিকা শব্দদ্বয় প্রতিস্থাপিত হয়ে ভাবসাম্যের সৃষ্টি করে। কিন্তু এসব কিছুকে সহ্য করে, প্রেম-প্রিয়া-প্রিয়ভাষণ ইত্যাদিকে সমীহ করেই তাঁর রাজনীতিচেতনা এগিয়ে যায়। তিনি নিজেই বলেছেন কবিতায়ঃ

'তোমার কোমল হাতের চেয়ে কম সুন্দর নয় সৃষ্টির হাতুড়ি,
যেমন প্রেমের চেয়ে কখনোই কম সুন্দর নয়, বিদ্রোহ।'
[নন্দনতত্ত্ব]

এই বোধ মহাদেব সাহার কবিতার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। কবি ষাটের দশকের উত্তাল সময়কে দেখেছেন, দেখেছেন মুক্তিযুদ্ধ। তাঁর কিছু কবিতায় মুক্তিযুদ্ধের এমন সব অনুভূতি প্রকাশিত, প্রত্যক্ষ সাক্ষী বা ভুক্তভোগী ভিন্ন অন্য কারো পক্ষে যা প্রকাশ করা অসম্ভব। যে গ্রাম প্রতিরাতে হাতছানি দিয়ে কবিকে ডাকতো উৎকণ্ঠিতা প্রেমিকার মতো, সেই গ্রামের এবং নিজ বাড়ির ধ্বংস স্তুপে দাঁড়িয়ে কবিমনের বিলাপ শোনা যায় 'ফিরে আসা গ্রাম' কবিতায়। এরপর শেখ মুজিব-হত্যা এবং তাঁর পরিবার-নিধন প্রসঙ্গে কবির আত্মোপলব্ধি এরকমঃ

'আমার অক্ষমতাই রাসেলের হত্যাকারী, সুলতানার ঘাতক
আমার স্বপ্ন, আমার ভালোবাসা, আমার কোমলতা
আমি তোমাকে বাঁচাতে পারিনি
আমার কাপুরুষতাই তোমার হত্যাকারী।'
[তোমার হত্যাকারী]

এখানে বিবৃতিধর্মী কয়েকটি পঙক্তি উদ্ধার করা হলো। মহাদেব সাহার কবিতায় বিবৃতির উপস্থিতি সামান্যই। তাঁর কবিতায় নরম শব্দের কাব্যিক দ্যোতনা মুখ্য। তিনি যখন দেশ, ভাষা, সংস্কৃতি, মূল্যবোধ, অধিকার ইত্যাদি রক্ষার জোর দাবি উত্থাপন করেন, তখনও সে ভাষা প্রায়শ রূঢ় হয়ে যায় নাঃ

'এদেশে কখন আসবে নতুন দিন? কখন উদ্দীপনা
অবসাদ আর ব্যর্থতাকেই দেবে নিদারুণ হানা
ছড়াবে হৃদয়ে আগামীর গাঢ় রঙ, ভাসাবে
মেঘের দূর নীলিমায় স্বপ্নের সাম্পান?'
[নববর্ষের চিঠি]

এই উদ্ধৃতিতে ছন্দের যথার্থতা আছে, শব্দের সহজ নির্বাচন আছে, পরম আশাবাদও বাদ যায় নি। তার পরও বলতে হয়, মহাদেব সাহা তাঁর কবিতায় আগে প্রেমিক, পরে অন্য কিছু। কারণ তিনি শুধু দেখেছেনই নন, সৃষ্টি করেছেন কবিতার 'সম্পূর্ণ আকাশ'। আর প্রেমিক ছাড়া সম্পূর্ণ আকাশ দেখাই সম্ভব নয়, সৃষ্টি করা তো কোন ছাড়ঃ

'যদি সত্যি সত্যি কেউ এই আকাশ দেখতে চায়, তাহলে তাকে
প্রেমিক হতে হয়,
কেবল একজন প্রেমিকই সম্পূর্ণ আকাশ দেখতে পারে।'
[একজন প্রেমিক যেভাবে আকাশ দ্যাখে]

দীর্ঘ পঙক্তির প্রতি পৃথক দুর্বলতা আছে মহাদেব সাহার। এটা তাঁর স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে একটি ফলকও বটে।

***

কবিতা হচ্ছে জীবনের শ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞতার নির্যাস: মহাদেব সাহা

কবিতা হচ্ছে কবির জীবনের অপার সুখ, অপার দুঃখ। দুঃখ, ত্যাগ ও সীমাহীন যন্ত্রণা এড়িয়ে কবি হওয়া যায় না। কবিকে স্বাতন্ত্র্যধর্মী, ব্যতিক্রমী হতে হয়। তাকে আগের লেখা ছাড়িয়ে নতুন ভাবনায় যেতে হয়। নতুন বোধ তৈরিই কবির কাজ আমি অল্পতেই আত্মহারা হয়ে যাই, ভালোবাসায়। কেউ ভালো ব্যবহার করলে তাকে আমি আমার সর্বস্ব দিয়ে দিতে পারি। একাকীত্ব ও ব্যর্থতাবোধও আমার মধ্যে কাজ করে। বন্ধুত্ব ও উষ্ণ সাহচর্যের খুব মূল্য দিই আমি। হাইজ্যাকাররা ধরেও আমাকে ছেড়ে দেয়, বুঝলে? ওখানেও আমার ভক্ত আছে। ষাট দশক বাংলা কবিতার পালাবদলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ দশকে রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ, ব্যক্তিগত অনুভূতি, সমাজ ও পরিপার্শ্বের বিবিধ বিষয় কবিচিত্তে আলোড়ন তোলে। বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান কবি মহাদেব সাহা সমাজ, ব্যক্তিজীবন, আনন্দ-বেদনার কথকতা তার কবিতায় তুলে ধরেন। তার কবিতা প্রকৃতিবন্দনা, মানব-মানবীর আনন্দ-বেদনা দেশপ্রেম ও সমাজভাবনায় সমৃদ্ধ। রাজনৈতিক দর্শন, প্রণয়, বিরহ, ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতা আর জীবনযাপনের খুঁটিনাটি একজন কবিকে কবিতা রচনায় কীভাবে প্রাণিত করে অন্তরঙ্গ আলাপচারিতায় মহাদেব সাহা ৯ সেপ্টেম্বর দৈনিক যায়যায়দিন পত্রিকা অফিসে শরতের এক সন্ধ্যায় তা আমাদের সঙ্গে ভাগ করে নেন। তার সঙ্গে এ আলাপচারিতায় অংশ নেন কথাসাহিত্যিক ও দৈনিক যায়যায়দিনের সাহিত্য সম্পাদক সালাম সালেহ উদদীন, প্রাবন্ধিক রতনতনু ঘোষ ও কবি সাইফুজ্জামান। নবীনরাই সাহিত্য বাঁচিয়ে রাখে। নবীনদের হাতেই সাহিত্যের বহমানতা। বাংলা কবিতা এমন পর্যায়ে পেঁৗছে গেছে যেখানে কারোরই আর খারাপ লেখা সম্ভব নয়। নবীনদের লেখা বেশ ব্যঞ্জনাধর্মী। তারা যথেষ্ট ভালো লিখছে।

সালাম সালেহ উদদীন: কবি মহাদেব সাহা আপনাকে শরতের এ সন্ধ্যার আলাপচারিতায় স্বাগত জানাই। আপনাকে দেখলে মনে হয় আপনি একজন উদাসীন অন্যমনস্ক মানুষ, সর্বতোভাবে কবি। আপনার পরনেও গেরুয়া রঙের পাঞ্জাবি। কবিতায় আমরা দেখি অসম্ভব শুভ্রতা, সৌন্দর্য প্রেমবোধ আর সামাজিক চেতনা। আপনার প্রথম বই 'এই গৃহ এই সন্ন্যাস' কাব্যগ্রন্থের প্রেরণা

কী? এসব কবিতা কীভাবে লেখা?
মহাদেব সাহা: সবটা ব্যাখ্যা করে বলা যাবে না। তবে এটুকু বলতে পারি সেই শৈশবেই মায়ের কাছ থেকে আমার ছন্দের কানটা তৈরি হয়। আমার মা খুব সুন্দর রামায়ণ, মহাভারত পাঠ করতেন। কিছু গানও লিখেছেন আমার মা। দু'একটা মনেও আছে আমার। মার লেখা গান এখনো মাঝে মাঝে আমার মনে পড়ে। আমি একমাত্র সন্তান। তবে একটি যৌথ ধনাঢ্য পরিবারে আমার বেড়ে ওঠা। রাখাল আর মধু বৈরাগীর কোলে আমি মানুষ হয়েছি। মধু দা গান শোনাতেন : 'বিয়া না করাইলে দাদা, আসাম যাবো গা, আসাম যাইয়া করব বাড়ি, বিয়া করব সুন্দর নারী; দাদা দেশে আসব না।'
আমার তিন চার বছরের স্মৃতিও মনে আছে। মা-র হাতেই আমার খাওয়া, তার কোলেই আমার ঘুম। বাইরের দিক থেকে দেখলে আমাকে ঠিক বোঝা যাবে না, আমার ভেতরটা দারুণ অগোছালো। বাইরেরটা গুছিয়ে রেখে এলোমেলো ভেতরটা ঢাকতে চেয়েছি। ভাইবোন না থাকলেও যৌথ পরিবারের মধ্য থেকে বড় হওয়া আমার। অনিয়ম করাই আমার স্বভাব। অনিয়ম আর নিজের প্রতি অযত্নের আমি মাস্টার। অনিয়ম করেও প্রকৃতির কৃপায় বেঁচে আছি। আমি বোধহয় বিশ্ববাউল, আমার কবিতায়ও আছে, আমি সবখানে থেকেও নেই, মন আমার পাগলা ঘোড়া। ভেতরে সন্ন্যাস ভাব আমার ছোটবেলা থেকে। আমার সঙ্গে যে সংসার করে সে জানে আমি কতখানি বোহেমিয়ান, কতোখানি খারাপ। স্কুলে থাকতে সাধুর পেছনেও ঘুরে বেড়াতাম। তাঁর কথা ছিল : সব ধর্মের মূলে এক। আর তা হলো কল্যাণ, শান্তি ও মানুষকে ভালোবাসা। আমার অনেক লেখা হারিয়ে গেছে। বাইরে থেকে যেমন মনে হয় আমাকে, আমি তা নই, তোমাদের চোখে ধূলা দেই, ভেতরে বড়ো অগোছালো, বড়ো ভাঙাচোরা, বাজে, বড্ড বাজে, অকম্মার ঢেঁকি, অপদার্থ। এইসব মিলে, আরো কতো কিছু, জানি না, বলতে পারবো না, 'এই গৃহ এই সন্ন্যাস' লিখতে প্রাণিত করেছে।
সাইফুজ্জামান: আপনি অসংখ্য প্রেমের কবিতা লিখেছেন। আপনার জীবনে নারীর প্রভাব কতটুকু?
মহাদেব সাহা: নারীভাগ্য আমার খুব ভালো। সেই কৈশোর থেকেই মেয়েরা আমাকে পছন্দ করে। আমি না, মেয়েরাই আমার প্রেমে পড়েছে। কতো মেয়ের যে ভালোবাসা, কতো মেয়ের যে চিঠি পেয়েছি। লেনাও দিল্লি থেকে চিঠি লিখতো আমাকে। চিঠিগুলো হারিয়ে ফেলেছি। নারী আমার কাছে চিরচেনা, চির-অচেনা। আমার কবিতায় তারা বার বার এসেছে, সীতা, মন্দিরা, মাধবী... এসব বেশি জানতে চেয়ো না, উস্কানি দিও না, চুপ করো। আমি খুঁজি বৈষ্ণবীকে। আবার মেয়েদেরই আমি সবচেয়ে বেশি ভয়ও পাই; কখন কার প্রেমে পড়ি। আমার প্রেমের কবিতা সন্ন্যাসেরই কবিতা। প্রেমের কবিতা তো বিচ্ছেদেরই কবিতা। অনেকে জড়িয়ে যেতে চায়। আমি সরিয়ে নিই, সরে যাই, কবিতা লিখি।
রতনতনু ঘোষ: আপনার কবিতার অনুপ্রেরণা কে?
মহাদেব সাহা: মা, নদী, বর্ষা। আমি যখন খুব নিচের ক্লাসে পড়ি বঙ্গবন্ধু তখন এসেছিলেন আমাদের স্কুলে একটি নির্বাচনী সভায়। আমি একটি কবিতা পড়েছিলাম। বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'তুই একদিন বড় কবি হবি।' সেই থেকে আমি কবি। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে আমি কবিতা লিখেছি। এর চেয়ে গৌরব জীবনে আর কী আছে? 'কফিন কাহিনী' সমকালে ছাপা হয় সেই ৭৭-এর দিকেই। ফুটনোটে লেখা ছিল : কবি হাসপাতালে শুয়ে কবিতাটি লিখেছেন। আমার যত বড় কবি হওয়ার কথা ছিল তত বড় কবি হতে পারিনি। আমি অফুরন্ত কাব্য উৎসের মধ্যে বড় হয়েছি। ছোটবেলায় বাবার সংগ্রহ থেকে কতো পত্রিকা, কতো বই আমি পড়েছি। কতোকিছুর কাছে যে আমি ঋণী, আমি খুব কৃতজ্ঞচিত্তের মানুষ।
সালাম সালেহ উদদীন: কোনো অপূর্ণতা বোধ করেন কি?
মহাদেব সাহা: পূর্ণতা কোথায়? প্রশ্নই ওঠে না। মহাজগতের মহাশূন্যতায় আমি ভাসছি। আমি নির্বাসিত। নিঃসঙ্গতা আমার চিরসঙ্গী। এত কোলাহল, জনারণ্যে থেকেও আমি একাকী, নিঃসঙ্গ।
সাইফুজ্জামান: আপনারা তিন কবি-বন্ধু নির্মলেন্দু গুণ, আবুল হাসান ও আপনি। আপনাদের বন্ধুত্ব কিংবদন্তীতুল্য। বন্ধুদের সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন কী।
মহাদেব সাহা: হাসানের সঙ্গে আমার স্বভাবগত মিল বেশি। হাসানও নির্জনতাপ্রিয়। ঢাকা শহরের এমন কোনো নির্জন জায়গা নেই যেখানে আমরা যাইনি। ঢাকার এমন কোনো স্টেশন, টার্মিনাল, পার্ক নেই যেখানে আমি আর হাসান যাইনি। 'তুমি ও তার এপিসোড' গল্পটি পড়ছো? পড়ে দেখো। নির্মল যে কোনো অবস্থার মধ্যে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারে। যে কোনো প্রশ্নের উত্তর যেন তৈরি থাকে। নির্মল আড্ডায় সব সময়ই উজ্জ্বল। ওর উইট ও রসিকতাবোধ অসাধারণ। দুইজনেরই রাজনৈতিক আদর্শ ও কাব্যচিন্তার ক্ষেত্র অভিন্ন । আমরা অসাম্প্রদায়িক রাজনীতি ও মানুষের কথাই চিন্তা করেছি। বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশ ও বাঙালি আমাদের বিশ্বাস। প্রেমই মানুষের প্রথম বিদ্রোহ, নির্মলের মধ্যেও এক বাউল বাস করে।
সালাম সালেহ উদদীন: আপনাদের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব ছিল কখনো? ব্যক্তিগত বা সাহিত্য-ঈর্ষা।
মহাদেব সাহা: আমরা প্রচুর তর্ক-বিতর্ক করেছি। কেউ কারো নিন্দা করিনি, গীবত করিনি কখনো। অন্যের কুৎসা নয় আমরা সব সময় নিজেদের টপকাতে চেয়েছি। নিজের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে নিজেকে অতিক্রম করাই ছিল আমাদের কাজ। অন্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতা নয়। কবিতার উপাদান আমরা জীবন থেকে সংগ্রহ করব, বই থেকে নয়। আমার একটি কবিতার নাম 'গোলাপের বংশে জন্ম'। কবিতার জন্য বন্ধুত্বের ক্ষতি হবে কেন? বন্ধুত্ব আরো গাঢ় হয়েছে। আমাদের মতো বন্ধু কজন হয়? আমাদের পরশ্রীকাতরতা ছিল না। পরনিন্দা করতে হবে কেন, নারী প্রেম, রাজনীতি কতো বিষয় আছে কথা বলার। নারীর ভালোবাসা বাদ দিয়ে কেউ পরের নিন্দা বন্দনা করে? আমাদের তিনজনের ভালোবাসা ভাবলে এখনো চোখে জল আসে। আমরা দীর্ঘ পথ একসঙ্গে হেঁটেছি। বন্ধুত্বে চিড় ধরেনি কখনো। রাজনৈতিক সঙ্কটের মুহূর্তে আমরা মিলিত সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমি নির্মলের থেকে হয়তো এক বছরের মতো

বড়, কিন্তু মাসের হিসাবে নির্মল আমার থেকে বড়ো এক মাসের।
রতনতনু ঘোষ: বিচিত্র বিষয় নিয়ে আপনি কবিতা রচনা করেছেন। কাব্যগ্রন্থের নামকরণেও আপনার রয়েছে অসাধারণত্ব। কবিতার উপাদান, লেখার বিষয় কিংবা নামকরণের বিশেষত্ব কীভাবে আপনি আবিষ্কার করেন?
মহাদেব সাহা: আমি অল্পতেই আত্মহারা হয়ে যাই, ভালোবাসায়। কেউ ভালো ব্যবহার করলে তাকে আমি আমার সর্বস্ব দিয়ে দিতে পারি। একাকীত্ব ও ব্যর্থতাবোধও আমার মধ্যে কাজ করে। বন্ধুত্ব ও উষ্ণ সাহচর্যের খুব মূল্য দিই আমি। হাইজাকাররা ধরেও আমাকে ছেড়ে দেয়, বুঝলে? ওখানেও আমার ভক্ত আছে।
জানো, কী বাজে মানুষ আমি, কতো যে মুদ্রাদোষ, দুই ঘণ্টা ওয়াশরুমে কাটাই। লাভও হয়, হাত ধুতে ধুতে, জল পড়ার শব্দ শুনতে শুনতে মনে মনে লিখেও ফেলি, কতো নাম পেয়ে যাই, কতো শব্দ। জন্ম-মৃত্যুর রহস্য কতো বিক্ষিপ্ত চিন্তা। এক চিন্তা থেকে আরেক চিন্তায় চলে যাই। আধা পাগল বুঝলে, বলা যায় না পাগলও হয়ে যেতে পারি, কিছু ঠিক নেই। আমার মতো একা থাকতে পারবে? দিনের পর দিন, কিচ্ছু না করে, শুধু ভেবে, আর ভেবে। পড়বো কেন, আমি ভাববো, পড়বে প-িতেরা, আমার কী দরকার? ভেবেই আমি সবকিছু চাই শিখতে, পড়ে কতোটুকু শেখা যাবে? বই পড়া বিদ্যা, না আমি এতো বিদ্যা টিদ্যার মধ্যে নেই। জ্ঞানের কথা রাখো, প্রেমের কথা বলো, প্রেমের জল হয়ে যাই গলে।
সাইফুজ্জামান : আপনার জীবনে কার গুরুত্ব বেশি?
মহাদেব সাহা: নীলার। সে-ই সব। সর্বাঙ্গিনী। তার হাতেই খাই পরি। সে-ই অভিভাবক, কড়া মাস্টার। নীলার অর্ডারে চলি। এক অবাস্তব জীবনযাপন করি আমি। অবসাদ, অবসন্নতা, বিষাদ, ভারসাম্যহীনতাও।
সালাম সালেহ উদদীন: এবার নবীন লেখকদের উদ্দেশে কিছু বলুন।
মহাদেব সাহা: নবীনরাই সাহিত্য বাঁচিয়ে রাখে। নবীনদের হাতেই সাহিত্যের বহমানতা। বাংলা কবিতা এমন পর্যায়ে পেঁৗছে গেছে যেখানে কারোরই আর খারাপ লেখা সম্ভব নয়। নবীনদের লেখা বেশ ব্যঞ্জনাধর্মী। তারা যথেষ্ট ভালো লিখছে।
রতনতনু ঘোষ: কবির থাকে স্বকীয় সত্তা ও স্বতন্ত্র স্বর। একজন কবির কী ধরনের আত্মপ্রস্তুতি ও জীবনযাপন প্রক্রিয়া থাকতে পারে আপনার মতে?
মহাদেব সাহা: রিলকে ঠিকই বলেছিলেন, কবিতা হচ্ছে জীবনের শ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞতার নির্যাস। আমিও তাই মনে করি। জীবনের মধ্যেই কবিতা। কবিতার মধ্যেই জীবন। জীবন থেকেই কবিতার পাঠ সংগ্রহ করতে হয়। জীবনকে পুড়িয়ে, ক্ষয় করে এই কঠিন কাজে নিজেকে প্রস্তুত করতে হয়। কবিতা হচ্ছে কবির জীবনের অপার সুখ, অপার দুঃখ। দুঃখ, ত্যাগ ও সীমাহীন যন্ত্রণা এড়িয়ে কবি হওয়া যায় না। কবিকে স্বাতন্ত্র্যধর্মী, ব্যতিক্রমী হতে হয়। তাকে আগের লেখা ছাড়িয়ে নতুন ভাবনায় যেতে হয়। নতুন বোধ তৈরিই কবির কাজ। শেষ পর্যন্ত সে একা হয়ে যায়। তার অন্তর্জগতে অংশীদারিত্বের কেউ থাকে না। ব্যক্তিজীবনে সে ছায়ার মতো বেঁচে থাকে। তার জীবনে বাস্তবজীবন থাকে না। নৈঃশব্দের ধ্বনিও তাকে শুনতে হয়। যা দেখা যায় না তাও দেখতে হয়। মূর্তিহীনকে সে মূর্তিময় করে তোলে, শরীরহীনাকে শরীরী করে তোলে। একজন কবিকে প্রতিনিয়ত ক্ষত-বিক্ষত হতে হয়। আর দশজন মানুষ থেকে সে আলাদা। আবার সে দশ জনের একজনও। কবি মানুষের থেকে কম অথবা বেশি।
সালাম সালেহ উদদীন: আমাদের সঙ্গে আলাপে অংশ নেয়ায় এবং এতো সব মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রকাশ করায় আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।
মহাদেব সাহা: তোমরা আমাকে এতো কিছু বলতে প্রণোদিত করায় তোমাদেরও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ভালো থেকো।

সম্পাদকীয়
পাঠক পরিষদের কথা
কবিতা
ছোট গল্প
রম্য রচনা
প্রবন্ধ
মুক্ত গদ্য
ধারাবাহিক
কল্প বিজ্ঞান
শিশুতোষ
ই-বুক
আর্কাইভ
লেখক পরিচিতি
যোগাযোগ
হোমপেজ

কবিতার দিনগুলি রাতগুলি

শুভেন্দু দেবনাথ
দিল্লী, ভারতবর্ষ

কবিতা সর্ম্পকে বস্তুতঃ আমি কিছুই জানি না। কোন কোন সকাল আমার বিকেল বলে মনে হয়, আর কোন কোন বিকেল সকালের মতো। কিন্তু এই মনে হওয়া , কেন যে আমার মধ্যে ঘটে জানি না। যেভাবে জানি না, কি ভাবে প্রথম আমি লিখে ফেলেছিলাম কিছু শব্দ। সে শব্দের সমাহার কবিতা হয়েছিল কিনা তাও জানি না। সমস্ত যৌবন ধরে আমি শুধু একটা ‘না’ এর সাথে দ্বৈরথ করে চলেছি। একটা ‘না’। ক্রমেই আমার স্মৃতি লুপ্ত হয়ে আসছে। কয়েক বছর আগেও আমি বহু প্রয়োজনীয় কথা মনে রাখতে পারতাম। এখন প্রয়োজনের ভার হাল্কা হয়ে আসছে। কেন এমন হচ্ছে বুঝতে পারিনা। কঠোপনিষদের কথা মাঝে মাঝে মনে হয় – যখন নচিকেতা বিশ্বরহস্য নাকি ব্রহ্মের স্বরুপ জানতে চাইছেন – তখন যম বলছেন আমার কথা শ্রবণ কর। হয়তো এর থেকেই কোনও উত্তর বেরিয়ে আসবে।

কবিতা সর্ম্পকে আমার ভাবনা আসলে ‘না’ ভাবনাই। যে নেতি আমাদের দিয়ে লিখিয়ে নেয় কথা। শব্দের পর শব্দ। এক একটি রুপের আভাস। শুধু এটুকু বলতে পারি প্লেটোর ‘গণরাজ্যে’র ‘না বাসিন্দা’ কবি কিন্তু আমাদের দর্শনে অন্যভাবে উত্থাপিত। সেখানে কবি সম্বন্ধে বলা হচ্ছে -- ‘কবিং পুরাণ মনুশাসিতরম্ অনোরনিয়া’ অর্থাৎ কবি একজন সত্যদ্রষ্টা। তবে এ তো গেল শাস্ত্রের বাদানুবাদ।

আমি কবিতা সর্ম্পকে কিছুই জানি না। শুধু জানি যখন আমাদের পুরোনো বাড়িটার ছোট্ট ঘরে অন্ধকার বাক্স-প্যাঁটরার ওপর শীতের দুপুরের এক চিলতে আলো এসে পড়ে। দু-একটি আরশোলা ফরফর করে উড়ে যায় রান্নাঘরের দিকে কিংবা একটি টিকটিকি বিনীত চিৎকারে জানিয়ে দেয় দুপুরের বয়স – তখন আমার ভিতর কীরকম যেন হয়ে যায়। হয়তো বা ঠিক সেইদিন বহুকালের না পারাগুলি একত্র হয়ে আমাকে দিয়ে লিখিয়ে নেয় কয়েকটি বাক্য। এর বেশী আমার আর কিছুই বলার নেই কবিতা বিষয়ে।

মাঝে মাঝে মনে হয় কি লিখছি কেন লিখছি? লেখা গুলো কি আদৌ কবিতা? বুঝি না। এক এক সময় মনে হয় লিখতে বসে আজ আর লিখব না, নিশব্দ বসে থাকব, নিশব্দের কি কোন শব্দ হয়? রোজ আমি বসি খাতা কলম নিয়ে কোন দিন শব্দ এসে ধরা দেয় কোন কোন দিন বা সাদা পাতায় ঝরে পড়ে একরাশ নিশব্দ।

নিশব্দে থেকো।
আজন্ম বধিরতা নিয়ে।
নিশব্দই এক একটি শব্দ তৈরি করে।...

আবার কখনো কখনো লিখতে বসে শব্দেরা প্রশ্নের আকার নেয়। আমার যন্ত্রনারা ভীড় করে এসে প্রশ্ন তোলে। এই যে জীবন যন্ত্রনারা ভীড় করে আসে কলমে এ যন্ত্রনার মুখ কি আমার আদৌ চেনা?

অন্তঃকরণে অভিমানে
রক্ত ঝর্না গুপ্ত প্রবাহিনী
এ যন্ত্রনার মুখ
আমি চিনি?

যখন মাঝ রাতে সমস্ত পাড়া ঘুমে আচ্ছন্ন ঠিক তখনই আমি এসে বসি আমার লেখার টেবিলটায়। কোন কোন দিন আমার নিজের জীবন কে লিখতে ইচ্ছে করে কোন কোন দিনে ফেলে আসা জীবনের দিকে তাকাই। তখন মনের কার্নিশে ভীড় করে আসে নানা প্রশ্ন জীবনের পরতে পরতে জড়িয়ে থাকা বিতর্ক। কখনো উত্তর পাই কখনো বা পাই না। আবার কখনো উত্তর পেলেও মনে হয় বোধ হয় ঠিক উত্তর পেলাম না তখন আবার ভীড় জমায় সেই একই প্রশ্নরা আবার আমি নতুন করে শুরু করি উত্তর খোঁজা এভাবেই জমে ওঠে জীবনের পাওয়া না পাওয়া সব প্রশ্ন উত্তরের খেলা।

কয়েকটি বিতর্ক রইলো। মাঝরাতে সবুজ জড়ানো
লতা ও গুল্মের মতো অন্ধকার। জানি
প্রতিটি প্রশ্নের গ্রাসে আহরিত প্রতিটি অজস্র নিরুত্তর
ক্ষমা করে। ভালোবাসে। পুনর্বার ক্ষুধিতের মতো
প্রসারিত হয়।

এক এক সময় পাগলের প্রলাপের মতো লিখে চলি, লিখেই চলি। কখনো সেই লেখা শব্দের মধ্যে জন্ম নেয় কবিতা কিংম্বা গল্প বা অন্য কিছু। আবার কখনো

কিছুই লেখা হয় না কিছু অর্থহীন শব্দ ছাড়া। এই যেমন এখন লিখে চলেছি। কি লিখছি কেনো লিখছি জানি না। কলমের ডগায় ভীড় করা শব্দদের একের পর এক বসিয়ে যাচ্ছি পর পর। কি এদের ভবিষ্যত কিংম্বা আদৌ কোন ভবিষ্যত আছে কিনা কে জানে। শুধু মনে হয় নিশুতি রাতে রোজ আমি সহবাস করি শব্দের শরীরে। আর এক সময় সেই সহবাস শেষে শব্দের সমস্ত শরীর জুড়ে আমার সমস্ত টেবিল জুড়ে আমার সমস্ত আত্মা জুড়ে উঠে আসে জন্মানোর গন্ধ।

সমস্ত শরীর থেকে জন্মানোর গন্ধ উঠে আসে
সহবাস
অগুরু মেখেছে কিংম্বা কাঁচা চন্দনের গন্ধ উরু ও জঙ্ঘায়
হঠাৎ শরীর থেকে গৈরিক শাড়ির টুকরো চুরি হয়ে যায়
লবঙ্গের কাথ মাখে ধমনীরা।

এক এক দিন ভাবি আজ একটা প্রেমের কবিতা লিখব, কিংম্বা একটা প্রেমের গল্প, কিন্তু লিখব বললেই তো আর লেখা হয়ে ওঠে না। হয়ত লিখতে বসলাম, কিন্তু মাঝ পথেই কলম অবাধ্য হয়ে ওঠে, বেঁকে বসে আর লিখবে না, তখন প্রেমের জায়গায় লিখে বসে বিদ্রোহের কবিতা। অথচ আমি তো বিদ্রোহের কবিতা লিখতে চাই নি। আমার মন মানে না কিন্তু কলম এগিয়ে চলে তর তর। আমি তাল রাখতে পারিনা, আমার অবশ মন কলমের বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য হয়। সাদা পাতার উপর আমার কলম ওগরাতে থাকে অক্ষরের তেজ।

কলমে ঠিকরে পড়ে অক্ষরের তেজ
হীরের টুকরোর মত কঠিন কথার খাঁজে খাঁজে
আকাঁড়া সত্যের মুখ, জ্বালা ধরায়, টুটি চেপে ধরে বলে
কান ধরে ওঠবোস কর দশবার।

হাল ছেড়ে দি। অথচ কি যন্ত্রনা। মিনিট দশেক আগেই আমি লিখতে চেয়েছিলাম একটা আস্ত প্রেম।আমি বারবার পিছন দিকে তাকাতে চাই কিন্ত কলমের কাছে আমি নিরুপায়, যেনো ও আমাকে একটা নির্দিষ্ট লক্ষণরেখা টেনে দিয়েছে।এক চুল ও এদিক ওদিক হবার যো নেই। যেনো এর বাইরে পা দিলেই আমি হারিয়ে ফেলব আমার সব অস্তিত্ব।বাধ্য হয়েই তাই ফিরে আসি বারবার বারবার।

পিছনে তাকাই নি আর, ছায়া দেখে ভুল পথে চলে যেতে যেতে
ফের ফিরে আসি লক্ষণরেখার মধ্যে আত্মরক্ষার তাগিদে।

কখন মনে হয় আমি তো প্রেমের কবিতা লিখতে চেয়েছি, কিংম্বা অন্য কিছু কিন্তু যাই লিখিনা কেনো আমার কলম কেনো বারবার আমাকে টেনে ধরে অন্য কিছু লেখায়? কেনো কেনো কেনো, তবে কি ওই প্রেম ফুল পাখি ঈশ্বর এসব কিছু নয় আমার মন আসলে বিদ্রোহের খোঁজ করে। সব কিছুকে ভেঙ্গে তছনছ করতে চায়। কিন্তু আমি ভয় পাই আর তাই বোধ হয় আমার বাইরের মুখোশের মতো আমার মনের আয়নায় আমি পরাতে চাই প্রেমের মুখোশ। আর আমার কলম আমাকে টেনে হিছড়ে দাঁড় করায় সত্যের মুখোমুখি।

কথাগুলি অক্ষরের ঠিকানা ধরে খুঁজে পায়
টেনে নিয়ে আসে বাইরে
প্রখর রৌদ্রের তেজে মুখ দেখে
নিজেকে দেখায়
সে শুধু অক্ষর নয় ভাঁজে ভাঁজে আকাঁড়া সত্যের মুখ।

এক সময় আমার মনের আর কলমের সব যুদ্ধ থেমে যায়। ভয় পেতে পেতে এক সময় মরিয়া হয়ে উঠে আমি দাঁড়াই মুখোমুখি সত্যের। নিজেকে চিনতে পারি। বুঝতে পারি ভয় পেতে পেতে এক সময় সত্যকে আমি অস্বীকার করেছি, ভুলে থাকতে ছেয়েছি আমার আসল ভাবনা কে আর তাই আমার অবচেতন মন কলমের সাথে ষড়যন্ত্র করে আমার সমস্ত লেখার টেবিল জুড়ে বিদ্রোহ করে চলে।

এই অপরাহ্ন বেলায় তাকে দেখে চিন্তে পারি
সে বড় অবুঝ রাখাল
ছায়া পেলে সেও নিদ্রা যায়।

সে কখনো আসবেই ভাবতে ভাবতে বিদ্ধ হয়েছে আমার চরাচর। সে কি ভীষণ নিষাদ? নাকি তীরন্দাজ? কে সে? যার লক্ষে থেকেছি আমি অবিচল স্থির। মাছের সূক্ষ্ম চোখে অর্জুন যে প্রতিদিন তারই সম্মানে খুলে রাখো টুপি, নতজানু হও অরণ্য চূড়ায় – এসব কথা লিখতে গেলে মোহনা প্রেমিক নদী কে ঈর্ষা করি, সমুদ্রে এত জল তবু নদীকে খাবেই সে জেনে ও বুঝে মেঘে মেঘে বেলা বাড়ার দিকে তাকাই, সময়ের হিমবাহ ক্রমশ গলে, ভাবনার সঙ্গে দূরত্ব বাড়ে, পারাপারের একমাত্র লেভেল ক্রশিং বেশির ভাগ বন্ধ, ফিসফাস শুনি.....

Share on Facebook

কার্তিকের কুয়াশা

রবিবারের রং কি? - সাইদুজ্জামান

সুখের লাগিয়া - ফিরোজা হারুন

Share on Facebook

সম্পাদকীয়

পাঠক পরিষদের কথা

কবিতা

ছোট গল্প

রম্য রচনা

প্রবন্ধ

মুক্ত গদ্য

ধারাবাহিক

কল্প বিজ্ঞান

শিশুতোষ

ই-বুক

আর্কাইভ

লেখক পরিচিতি

যোগাযোগ

হোমপেজ

Share on Facebook

সম্পাদকীয়
পাঠক পরিষদের কথা
কবিতা
ছোট গল্প
রম্য রচনা
প্রবন্ধ
ধারাবাহিক
কল্প বিজ্ঞান
শিশুতোষ
ই-বুক
আর্কাইভ
লেখক পরিচিতি
যোগাযোগ
হোমপেজ

রবিবারের রং কি?

সাইদুজ্জামান

গল্প এবং সংবাদের মধ্যে একটা পার্থক্য নিশ্চয় আছে। প্রেম-পিরীতির গল্প বলে কথা আছে বটে, তবে প্রেম-পিরীতির সংবাদ বলে এমন কোনো আজগুবি কথা এই ত্রিভুবনে কেউ শুনেছে? প্রেম বলে কিছু নেই, কিছুই নেই? তা সে যাই হোক, স্বল্প কথায় বলি আমার একটা গল্প আছে বলার, আর একটা ভয়ও আছে আর কখনো যদি এই গল্প-টি বলা না হয়ে ওঠে।

টরন্টোর স্বল্পায়ু গ্রীষ্মকালে আলস্যময় রবিবারে স্মৃতির ভিতর থেকে গল্পের জামা কাপড় খুলে বেরিয়ে আসে নগ্ন একটি সংবাদ।

রবিবার, মে ৫, ১৯৯৬ইং। শুভময়ের বউ অনুরাধা আত্মহত্যা করে ঐদিন।

রবিবার, মে ৫, ২০১১ ইং অনুরাধার মেয়ে অহনার বয়স ১৮ বছর হয়ে এলো।

রবিবার, মে ৫, ২০১১ ইং শুভময় নিজেকে শুধোয় রবিবারের রং কিগো?

সে দুকান ভরে শোনে বর্ণের কোলাহল, দুচোখ ভরে দেখে শব্দের অপরূপ রূপ। বিজ্ঞানীরা একেই কি বলে সপ্তম ইন্দ্রীয়, নাকি সিনেস্থেঝিয়া?

শুভময় ১৮ বছর বয়সেই বিদেশে চলে যায় এঞ্জিনিয়ারিং পড়তে। ১৯৮২, কোলকাতা-মস্কো, জীবনের প্রথম উড়োজাহাজ ভ্রমণ। জীবনের প্রথম পিছনে ফেলে যাওয়া এক অমীমাংসিত ভালোবাসা, একজন অনুরাধা সরে গেলো দূরে, সরে গেলো জীবন থেকে। সামনে অহংকারী সুবর্ণ সোভিয়েত দেশ। অনুরাধার সাথে তার সম্পর্ক যে বিভিন্ন কারণে অসম্ভব, তা দেশ ছাড়ার আগেই জানতে পারে শুভময়।
অনুরাধা-শুভময় খুব নিকট না হলেও আত্মীয়, রক্তের সম্পর্কও আছে। অনুরাধার দিদিমা আর শুভময়ের ঠাকুরদা আপন ভাই-বোন। যদিও দু'বাড়ির মধ্যে সাধারণ যোগাযোগ আছে, অনুরাধার বাবা-মা দুজনেই ওদের সম্পর্কের প্রতিকূলে। ওর বাবা এবং দাদা অনুরাধাকে মারধোরও করেছে। বুকের ভিতর এক তীব্র ব্যথা পেঁচিয়ে ওঠে শুভময়ের, মানুষের নির্বুদ্ধিতার কি সীমা-পরিসীমা নেই? প্রকৃতই সীমা-পরিসীমা নেই, তাই তো শুভময় আর পিছনের দিকে তাকাতে চায় না। সে এই নতুন প্রবাসী কর্মচঞ্চল জীবনে নিজেকে ডুবিয়ে দেয়। সময় বয়ে যায়। ইভান বুনিন, বরিস পাস্তেরনাক, সের্গেই ইয়েসেনিন – অন্যান্য আরও অনেক কিছুর সাথে এইসব বিখ্যাত লেখকদের মূল রচনা নিয়ে তার জীবন ভালই কাটছিলো। বছর পাঁচেক এ রকম ভালো থাকা।

তারপর একদিন ডাকে চিঠি আসে কোলকাতা থেকে। অনুরাধার চিঠি। সংক্ষিপ্ত এবং স্পষ্ট। 'তোমার ঠিকানা পেয়েছি তোমার বোন স্মিতার কাছে। যদি অসম্ভব না হয় একবার দেশে এস। আমি ভালো নেই, তুমি ভালো থেকো। -অনুরাধা'।
'আমি আসছি অনু...আমি আসছি...অ...নু...' , এই অনন্য চিতকার অনন্ত কুয়োর গভীরে এক প্রতিধ্বনির মতো শোনায়। এইসব ধ্বনি-প্রতিধ্বনির সাক্ষী থাকে না।

শুভময়ের সুখের ট্রেন ভুতের কিলে লাইনচ্যুত হয়ে গেলো। খাদের পাশে চাঁদের ডাকে ফিরে এলো সে কোলকাতায়, ঘুরে দাঁড়ালেও ক্ষতি

কিছু ছিল না তবু ফিরে এলো একাকী অনুরাধার আয় আয় ডাকে। ভেন্যু: কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ঝোপের ছায়ায় খোলা মাঠের ঘাস। দীর্ঘতম পাঁচটি বছর পর এই দেখা হওয়া। শুভময় তাকিয়ে থাকে অনুরাধার চোখে চোখ রেখে। ফুরিয়ে ফেলতে ইচ্ছে করে না এই মুহূর্ত। কিছু শুনতে চায় না, যেতে চায় না কোথাও। শুধু তকিয়ে থাকতে ভালো লাগে অনুরাধার দুচোখ থেকে বেরিয়ে আসা সাংঘাতিক সুন্দর বিপজ্জনক এক জোছনার দিকে। শুভময়ের কোনো বক্তব্য নেই, অনুরাধার কিছু বলার আছে।

- আমার অনেক দুর্ঘটনা ঘটেছে শুভ, এই গত বছরগুলোতে।
- অনু, আমাকে আজো তুমি বন্ধু ভাবলে বলতে পারো কি হয়েছে, আমি যদি পারি সাহায্য করবো।
- তোমার শুনতে খারাপ লাগবে শুভ।
- না লাগবে না, আমার কোনো কিছুতেই খারাপ লাগে না।
- শুভ, আমি এক ছেলের হাত ধরে চলে গিয়েছিলাম পালিয়ে বিয়ে করতে, বিয়েটা যদিও শেষমেষ হয় নি।

এমন কিছুই কি হওয়ার কথা ছিল না? অনুরাধার মতো সুন্দরী মেয়ে কোলকাতায় হাত গুটিয়ে বসে থাকবে সেরকম আশা শুভময় করেনি। ওর কাছে খুব-ই স্বাভাবিক মনে হয়েছে অনুরাধার সংক্ষিপ্ত ব্যর্থ প্রেমের দুর্ঘটনা। তবু আরো একবার বুকের ভিতর তীব্র ব্যথা পেঁচিয়ে ওঠে। পেঁচিয়ে ওঠে রেস্তরাঁর নীল আলোয় সিগ্রেটের ধোয়ার মতো। সামলে নেয় শুভময়। তার সামনে যে মেয়েটি তার নিতান্ত ব্যক্তিগত এবং কষ্টকর অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করছে, তার কষ্ট নিশ্চয়ই শুভময়ের চেয়েও বেশি। শুভময় বন্ধুত্বের হাত বাড়ায়, সে শুনতে চায় সমস্যার কথা, দিতে চায় সমাধান। অনুরাধা বলতে থাকে এক এক করে সব। সেই ছেলেটির কথা যাকে ভালোবেসে পালিয়ে বিয়ে করতে চেয়েছিলো। সেই মাঝবয়সী ম্যাজিস্ট্রেটের কথা যে হতে দেয় নি এই বিয়ে, ফিরিয়ে এনেছে তাকে তার বাবা-মার কাছে। এ পর্যন্ত গল্পটি জলের মতো সহজ হতে পারতো, জীবন মানেই সব সময় নদীর মতো সরল গা ভাসানো নয়, জলপ্রপাতের মতো জটিল ক্রুদ্ধ আছড়ে পড়াও আছে। ম্যাজিস্ট্রেট ক্ষমা করেনি অনুরাধার যৌবনকে, পেশাগত নীতিমালা, দায়িত্বে সততা, বয়সের ব্যবধান সবই কি তুচ্ছ হয়ে যায় যৌনতার জাদুঘরে? সর্বত্রই নয়, শুধু অনন্ত কুয়োর জলে ব্যাঙ এই বঙ্গভূমে। রবি কবির সেই বিখ্যাত লাইনটি মনে পড়ে শুভময়ের: সাত কোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধ জননী, রেখেছো বাঙালি করে মানুষ করনি। রাশিয়ায় হলে এমনটি হতে পারতো? না, পারতো না। এতগুলো বছর ইউরোপে থেকে শুভময়ের দৃষ্টি যেনো খুলে গেছে অনেক, বাঙালি বলে গর্ব করার ভরসা সে খুব একটা পায় না, নিজ বঙ্গভূমে বালক-বৃদ্ধ-বণিতা নির্বিশেষে মানুষের মানসিক দীনতা তাকে আহত করে। বড় ইচ্ছে হয় অনুরাধা নাম্নী এই ডিপ্রেস্ড মেয়েটিকে সাহায্য করতে যে কোনো মূল্যেই। শুভময় অনুরাধাকে ভালোবাসে, দান দিয়ে প্রতিদানের আশায় নয় এই সাহায্য করতে চাওয়া। এই ভালোবাসা নিঃস্বার্থ। একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধে নামার মতো এই ভালোবাসা। শুভময় প্রস্তাব করেঃ অনু, তুমি আমাকে বিয়ে করবে? আমাকে তোমার বাবামার সাথে কথা বলতে দাও, তোমারতো পুরো জীবনটাই প্রায় সামনে পড়ে আছে। বাবা-মার সাথে কথা বলার ব্যাপারে অনুরাধা পাশ কাটে, রাজি হয় না। ও প্রস্তাব করে কোর্টে বিয়ে করতে। কোর্ট তা কোর্টই হত, অনুর দাবি ওর সেই ম্যাজিস্ট্রেটের কাছেই যেতে হবে। হৃদয়ের চেয়ে শারীরিক সম্পর্কই বোধ হয় প্রবল বেশি, যত দূরই হোক না কেন সেই স্মৃতি। অনুরাধার সাথে মধ্য বয়স্ক বিবাহিত ম্যাজিস্ট্রেটের সম্পর্কটি যত কালোই দেখাক না কেন, মানুষের শ্রেষ্ঠ জীববৈজ্ঞানিক রসিকতাটি এই যে কাঙ্খিত বা অনাকাঙ্খিত, স্বল্পায়ু বা দীর্ঘায়ু, মধুর বা বেদনা বিধুর যে কোনো যৌন সম্পর্কই হৃদয়ে এক দীর্ঘস্থায়ী স্থান দখল করে থাকে, তা কখনই সম্পূর্ণ ঘৃণার নয়, কে জানে হয়তো আদৌ ঘৃণার নয়। ভালো লাগে না শুভময়ের এইসব। তবু সে মেনে নিতে থাকে এক এক করে সবই যা তার ভবিষ্যত স্ত্রী করতে চায়। অনুরাধার প্রাক্তন বুড়ো প্রেমিক ওদের বিয়ের কাগজ রেজিস্ট্রি করে। অনুরাধার চোখের তারায় বুড়ো প্রেমিকটির জন্য এক বিশেষ মায়া শুভময়ের দৃষ্টি এড়াতে ব্যর্থ হলো। নাটকটির যবনিকা

পতন হওয়া উচিত ছিল এখানেই, তবে হলো না। আরও অনেক কিছু দেখার আছে। শুভময় দেখবে। দেখে যাওয়ার জন্যই কি এই জন্ম শুভময়ের?

বিয়ে ফেরত শুভময় একাকী বিদেশে। বুকের ভিতর তীব্র ব্যথা পেঁচিয়ে ওঠে। সুরঞ্জনা সাপের মতো পেঁচিয়ে ওঠে বুকের ভিতর বুকের ব্যথা, মাঝে মধ্যে উঠে আসে গলার কাছে, পেঁচিয়ে গোল হয়ে থাকে, কোথাও বিশেষ পালিয়ে যায় না। কোলকাতা থেকে অনুরাধার ডাক-চিঠি আসে নিয়ম মাফিক। অনুরাধার মত বদলেছে। কোর্টের বিয়ে কোনো কাজের কথা নয়, ধুম-ধাম করে এবার বিয়ের পার্টি করতে হবে। বাবামাকে এবার একটু শান্তি দিতে চায় অনুরাধা। বাবামাকে এই একটু শান্তি দেওয়ার কথা অনুরাধা আর একটু আগে ভাবলেও পারতো। শুভময় নিজেই তো তাকে সেরকম কথাই বলেছিলো তখন।

আবার কোলকাতা। কলিকাল কি কলিকাতাতেই? খুব ধুমধাম করে ধর্ম মতে বিয়ের পার্টি করাটাই মুখ্য নয়, অনুরাধার এবারেও কিছু কথা আছে। ইশ্বর মুক্তি দাও, জানো তো পারবো না সইতে এতসব। মুক্তি? এক্ষুনি? একটু অসম্ভব – এই প্রেক্ষাগৃহে তুমিই নির্বাচিত দর্শক শুভময়। দেখে যাও, শুধু চোখ মেলে দেখে যাওয়া, আর তো কিছু নয়। অনুরাধার এবারের প্রেমিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, একই সাথে পড়ে। অনুরাধা যদি তার এই বারবার প্রেমে পড়ার বিষয় আশয় গোপন রাখতো তাহলেই বরং শুভময় বুঝি খুশি হত বেশি। তা কি করে হয়? অনুরাধা ঠকাতে চায় না বরকে। কবে কখন ওর মরুভূমির মতো খা খা করা ঠোঁটে পদ্মাপাড়ের এই ব্র্যান্ড নিউ যুবক প্রেমিকটি চুম্বন ভোগ করেছিলো তার নিখুঁত বর্ণনা দিলো অনুরাধা। বাধ্য করলো ব্যক্তিগত সাক্ষাতেও। বিয়ে–পার্টির আয়োজন নিস্তরঙ্গ হলো না। শুভময়ের দেওয়া শাড়ি গহনার কিছুই অনুরাধা পরিবারের পছন্দ হলো না। যাদের সাধ্য থাকে না তাদের সাধ আসে কোত্থেকে এই কথাটা অনুরাধার বাবামার মাথায় এক সুদীর্ঘ সময় ধরে সেধোলো না কিছুতে। অনেক পিষ্ট হলো, তিক্ত হলো লেবু। বিবাহ উতসবে যুবক প্রেমিক ভগ্ন বুকে বর কনের ছবি তুলে গেলো। শুভময় তাকিয়ে দেখে যুবকের মুখে অন্ধকার আর বিষাদ। হে ঈশ্বর!

ফুলশয্যার রাতে বর, বধু, ফুল, অথবা শয্যা কোনটাই সেরকম অর্থ বহন করলো না। জীবনে একবার আসা এমন রাতেও রবীন্দ্রনাথের কোনো কবিতা মনে এলো না। বাংলা সাহিত্যের অন্য একজন কবি শুভময়ের জীবনে খুব প্রভাব ফেলেছেন, অগত্যা তিনি-ই এলেন। কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়। ‘রাত দুপুরের শ্মশান চিতা আমাকে দাও কোল’ কবিতাটাই বারবার খুব মনে পড়লো। ফুল শয্যার ফুলগুলো শুকনো ডালপালার মতই মনে হলো তার। বিরতি বিহীন সুখী মুখের জন্য এইভাবে সংগ্রাম করে যাওয়া। বুকের ভিতর সুরঞ্জনা সাপটি খেলায় মত্ত, বুক থেকে গলা, গলা থেকে মাথার ভিতর উঠে পড়ে কখনো সখনো। বাথরুমের আর্শিতে পরীক্ষা করে দেখে শুভ - চোখের কোথাও আকস্মিক জল আছে কি না। না নেই। সে এবারও পেরেছে চেপে যেতে বুকের নিদারুণ ব্যথা।

আর মাতৃভূমি নয়, এখন থেকে ফুলটাইম প্রবাসী জীবন। অনুরাধার মতো বউকে শুধু বউ হিসেবে বিদেশে নিয়ে যাওয়া যায় না। সে ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট ছিল, তার ভবিষ্যত ক্যারিয়ার নষ্ট করা অমানবিক দেখায়। স্কলারশিপ দিয়ে তবেই তাকে বিদেশে নিতে হবে। অনুরাধার বাবা যেরকম প্রভাবশালী ব্যক্তি, উনি ইচ্ছে করলেই দু দশ জনকে স্কলারশিপ দিয়ে রাশিয়ার মতো দেশে পাঠাতে পারেন। তবে সেতো অনুরাধার বাবার যোগ্যতা, ও কথা তোলার এখন কোনো মানেই হয় না। অনুরাধা এখন শুভময়ের বউ, বাবার সাহায্য এখন কেন নেবে? সাধ আছে সাধ্য নেই? শুভময়কে অনুরাধা পরিষ্কার জানিয়ে দিলো বাবার সাহায্য সে নিতে পারবে না, তবে যে ক’ টা দিন শুভময় অনুরাধার জন্য স্কলারশিপ না জুটিয়ে দিতে পারছে সে বাপের বাড়িতেই থাকবে। অনুরাধা, অনুরাধার বাবা, মা, দাদা, এমন কি কাজের ঝিও শুভময়কে জানিয়ে রাখলো শুধু শুভময় ছাড়া ও পরিবারের আর কারো সাথে মিশবার অভিপ্রায় এ পরিবারের কারোরই

নাই। শুভময়, একমাত্র তুমিই ভালো, তুমিই ব্যতিক্রমী, তুমি ছাড়া তোমার অন্য কোনো স্বজন আমাদের সমাজের যোগ্য নয়। এটাই পরিষ্কার জানিয়ে রাখলো অনুরাধার পরিবার। শুভময় দেখলো, শুনলো, ভাবলো, শুধু বললো না কিছুই। মনে মনে একটু হাসলও বুঝি সে। শুভময়ের ঠাকুরদা অভিজাত জমিদার বংশের শেষ জমিদার ছিলেন অনুরাধার দিদিমা তা ভালই জানেন। একটা সময় ছিল অনুরাধার বাবা শুভময়ের পরিবারে দাসত্বের যোগ্যতাও পেত কি না যথেষ্ট সন্দেহ হয় শুভময়ের। খুব হাসি পায় শুভময়ের। সে নিজেও দেখেছে চোদ্দটা খালি সিন্দুক, ওগুলোর ভেতর এক সময় ইটের মতো সোনার বার সাজানো থাকতো, ঘোড়াশালে ঘোড়া থাকতো, হাতি-ও ছিল। ঠাকুরদা হাতি চড়ে বাজার করতে যেতেন। তাঁর বাজার করা শেষ হোলে তবেই অন্যরা বাজার করার সুযোগ পেত। ঠাকুরদাটা এক জীবনে জমিদারির পুরোটাই সব উড়িয়ে দিলেন। ভালই করেছেন বোধ হয় ঠাকুরদা। জাগতিক বিষয় আশয়ের প্রতি শুভময়ের মোহ মমতা হয় না। তবে তার পারিবারিক ইতিহাসটা খুব ভালো লাগে। সেই একদা জমিদার পরিবারের কারো যোগ্যতা আজ আর নাই অনুরাধাদের সাথে মিশবার? খুব হাসি পায় শুভময়ের। একটা সময় ছিল – সেই সময় এখন আর নাই। মেয়ে মানুষের অভাব পৃথিবীতে খুব একটা নেই, শুভময়ের জন্যও নেই। ইচ্ছে করলেই সে নাটকের দৃশ্য বদল করে দিতে পারে। কাগজে যে স্বাক্ষরে অনুরাধা ‘বউ’ হয়েছে ঐ একই স্বাক্ষরে সে ডিভোর্সী হতে পারে, এমন কিছু কঠিন কাজ তো নয়। তবে ঐ যে প্রেক্ষাগৃহের নির্বাচিত একক দর্শক শুভময়, চলচ্চিত্রটি যে এখনো শেষ হয় নি।

মস্কোয় সোভিয়েত শিক্ষা মন্ত্রণালয় শুভময়ের আবেদন মঞ্জুর করলো। পেট্রোকেমিক্যাল এঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্কলারশিপ পেলো অনুরাধা। প্রথম বছর রুশ ভাষা শেখা। এ ভাষাতেই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা। রুশ ভাষা শেখা কতটা সহজ বা কতটা কঠিন তার উপর পাতার পর পাতা লেখা যেতে পারে, তবে ঐ বিষয়টা প্রাসঙ্গিক নয় এখানে। যে কোনো শিক্ষাই ইচ্ছা নির্ভর বলে মনে করে শুভময়। অনুরাধার ভিতর ঐ ইচ্ছা নেই। বাঙালি মেয়ে মাত্রই কি প্রবাসে জীবন্ত শবদেহের মতো? সম্ভবত নয়, তবু শুভময়ের এই শবদেহ কাঁধে নিয়ে ফেরা। প্রতিদিন বাড়ি থেকে শ্রেণীকক্ষের দোরগোড়া পর্যন্ত দিয়ে যাওয়া, নিয়ে যাওয়া, বাজার করা, রান্না করা, রাতে হোমওয়ার্ক করে দেয়া। শুধু তারপর রাতদুপুর হয়ে এলে, ব্যালকনির নিঃসঙ্গ চেয়ারে বসে সিগ্রেটে একটি সুখের টান দিয়ে দূর অন্ধকারের দিকে বিষন্ন তাকিয়ে শুভময় বলতে পারেঃ হে ইশ্বর!

এতদিন তবু সহনীয় ছিল, অনুরাধা এবার তার সেরা খেলাটি খেলতে শুরু করলো। প্রতীয়মান কোনো কারণ ছাড়াই ব্লেডে শরীরের বিভিন্ন স্থান কাটছে – রক্তপাত হলে নাকি তার ভালো লাগে। শরীরের অনাবৃত অংশের ভিতর দু হাতে এবং মুখে ভরে থাকছে অসংখ্য দাগ। কয়েকবার আত্মহত্যার চেষ্টাও সে করলো ঘুমের অসুধ খেয়ে। হাসপাতালে নিয়ে যেতে হলো বার দুয়েক, পুলিশের মুখোমুখিও হতে হলো শুভময়ের। অনুরাধাদের ডীন শুভময়কে ডেকে অনুরাধা কোনো নার্কটিকে আসক্ত কিনা এ নিয়ে নানারকম সংশয় প্রকাশ করলেন। একদা উচ্চশির শুভময়ের মাথা ক্রমাগত হেঁট হতে থাকলো।

দাম্পত্য যুদ্ধ বেঁধে গেলে বুদ্ধি দিতে কিভাবে যেন লোক জড়ো হয়ে যায়। তাদেরকে দোষ দেয়া যায় না। অনেকেই পরিষ্কার বুঝলো সমস্যার মূলে রয়েছে একটি সন্তানের অভাব। আজকাল খুব ক্লান্ত বোধ করে শুভময়, স্রোতের অনুকূলে গা ভাসিয়ে দিতে ইচ্ছে করে। দশজন বিচক্ষণের ধারণা মিথ্যে করার জন্যই বুঝি অনুরাধা গর্ভবতী হলো একদিন। অন্য আর একদিন অনুরাধার উপর্যুপরি তর্জন গর্জন এবং হুমকির মুখে শুভময়কে ব্যবস্থা নিতে হলো অকারণ গর্ভনাশের।

বাপের বাড়ি কোলকাতা ঘুরে এলো অনুরাধা গ্রীষ্মের ছুটিতে। মস্কো ফিরে এসে শুভময়ের সাথে সে আর ঘর করবে না পরিষ্কার জানিয়ে দিলো। শুভময়ের কোনো আপত্তিই নেই। বিদেশে ডিভোর্স দূতাবাসেই হয়। দূতাবাসে আবেদন করা হলো যথারীতি। কয়েক ঘন্টার মধ্যেই অনুরাধা উচ্চপদস্থ অফিসারদের সাথে তুমুল বাধিয়ে নিলো। অনুরাধার

বাবামা ফোনে অনেক কাকুতিমিনতি করলো শুভময়ের কাছে, বিয়েটা যেন কোনভাবেই ভেঙ্গে না যায় এই বলে। আর একটু হলে বেঁচে যেতে পারতো শুভময়, তা আর পারলো না। বিবাহ বিচ্ছেদ ভেঙ্গে গেলো, শুভময়ের করুণাবশে।

কয়েক মাস পর শুভময় নিজে কোলকাতায় বেড়াতে এলো একাই। অন্তহীন জামাই আদর পেলো। শুভময়ের মতো মহামানব নাকি অনুরাধার বাবামা তাদের জীবনে আর দেখে নি। শুভময়ের যথেষ্ট আপত্তি থাকা সত্ত্বেও তার পকেটে একলক্ষ টাকার পরিমানে ডলার গুজে দিলো ওরা। শুভময় কারো সাথেই টাকা পয়সার সম্পর্কটা রাখতে চায় না। তবু বাধ্য হয়েই নিলো, সে জানে এ পয়সার একটিও সে নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করবে না।

শুভময় পি এইচ ডি করছে। ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে খুব। বৌয়ের পাগলামি কমে নি কিছুই। এতদিন ওরা ভাড়া বাড়িতেই থাকতো। সে এবার ইন্টারন্যাশনাল হস্টেলে মুভ করার সিদ্ধান্ত নিলো। ওখানে ওদের মতোই নানা দেশের অনেক ছাত্র-ছাত্রী আছে। অনুরাধার সময়টা হয়তো ভালো কাটবে। ওরা ফ্যামিলি রুম পেলো হস্টেলে। অনেক বাঙালি ছাত্রও আছে ওখানে, বাঙালি মেয়ে বলতে বিশেষ কেউ নেই। যারা আছে তারা অনুরাধার মনের মতো নয়। বাঙালি এক যুবকের সাথে বেশ ভাব হয়ে গেলো অনুরাধার। যুবকের নাম অতীন। শুভময়কে আর যাই হোক রিটার্ডেড বলা চলে না। সংসারে বৌয়ের নখর থেকে গা বাঁচাতে শুভময়ের মতো কোটি কোটি পুরুষ চোখ বুজে এড়িয়ে যেতে বাধ্য হচ্ছে আনসাইটলি অনেক দৃশ্যাবলী। শুভময় একক দৃষ্টান্ত নয়। অনুরাধা–অতীন, এই নাটকের বিশেষ এবং চূড়ান্ত এক অধ্যায়।

আর দশজন মানুষের তুলনায় ওদের ঘর বড়ই নিকৃষ্ট মানের, কালার টি ভি নেই, উল্লেখযোগ্য কোনো ইলেকট্রনিক্স নেই, এসবই অনুরাধার অভিযোগ। শুভময় একদিন পুরো একলক্ষ টাকাই খরচ করে ঘর সাজিয়ে ফেললো। সেইসব ইলেকট্রনিক্স পাথর ছুড়ে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করতে এক ঘন্টার বেশি সময়ও লাগলো না অনুরাধার। শ্বশুর বাড়ির শাল সেই একলক্ষ টাকা অবশ্য অনুরাধার নিজের কাছে এবং তার বাবামার হিসেবের খাতায় শুভময়ের নামেই ধার হিসেবে অক্ষত রইলো।

তিন মাসের গর্ভ শুধু খেয়াল বশে নাশ করার হৃদয়-ওয়ালা অনুরাধার হঠাত আবার মা হবার ইচ্ছে যথেষ্ট সন্দেহজনক। সন্দেহ-বাতিক শুভময়ের নেই। প্রেক্ষাগৃহের নির্বাচিত একক দর্শক হিসেবেই সে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে। শুভময়ের তবু ভালো থাকা হয় না। ত্রিভুজ প্রেমের জটিলতম ট্রাজেডিই হলো একই টাইম এবং স্পেসে পুরুষ বাহু দুটির সাথে ভূমি নারী দেহটির নির্লজ্জ চূড়ান্ত সঙ্গম। জ্যামিতিক বহুভুজের জন্য ন্যূনতম তিনটি লাইনের প্রয়োজন হয়। দু লাইনের জ্যামিতিক আকার নেই, তিন লাইনের আছে। এ কারণেই গতানুগতিক দ্বিভূজ প্রেমের কোনো গল্প হয় না, গতানুগতিক দ্বিভূজ প্রেম সর্বদাই অদৃশ্য, সর্বদাই নিরাকার। জয় ত্রিভুজ, জয় ত্রিভুবন, জয় ত্রিকাল।

তিন মাস পার হয়ে গেলো,ন’ মাস দশ দিন হয়ে এলো। দুজন পুরুষের একনিষ্ঠ সেবা শুশ্রূষা, মায়া মমতায় ২২ শে জুন, ১৯৯৩, মধ্যরাতে অনুরাধা মা হলো। মাতৃসদন চত্বরে রহস্যময় আলো আঁধারির ভিতর দুরু দুরু বুকে দুজন পুরুষকে পায়চারি করতে দেখা গেলো। একজন আয়া এসে শুভময়ের জামার আস্তিন টেনে ধরে খুব হাসি মুখে বললোঃ তোমার চাঁদের মতো এক মেয়ে হয়েছে গো! দাঁড়িয়ে থাকলো কিছুক্ষণ আয়াটি পুরস্কারের আশায়। শুভময় কিছু টাকা দিয়ে আয়াটিকে বিদেয় দিলো।

শুভময় -অনুরাধার ঘরখানি ভরে উঠলো। একটি শিশু সত্যই বড় শক্তিমান। পৃথিবীর অন্ধকার মুখে হাসি ফুটানোর জন্যই শিশুদের এই আসা। ঘরের প্রতি এতদিনকার কেন্দ্রাতিগ শক্তিটি আজকাল আর বোধ করে না শুভময়। সে খুব খুশি, সে খুব সুখী, সে এখন খুব ঘরমুখো। শুধু অনুরাধাই আগের মত ঘর বিমুখী, শিশুর জন্ম তার জীবনে সেরকম

লক্ষণীয় পরিবর্তন আনতে পারলো কই? সময়মতো মাতৃদুগ্ধও ঠিক মতো পেলো না শিশুটি। যে কোনো ছুতোয় অকারণ হৈচৈ বাঁধিয়ে অনুরাধা আজো সুখ পায়। শুধু রাগ দেখিয়ে ক্ষুধার্ত শিশুকে খেতে না দিতে বুঝি মায়েরাই পারে। শুভময়ের দুচোখ বাষ্পাকুল হয়ে ওঠে। শুভময়ের এই নিরুপায় মুখখানি দেখতেই বুঝি অনুরাধার বড় ভালো লাগে। শিশুটিকে বুকে নিয়ে বাইরে পার্কে শুভময় হাঁটে, গান গায় গুনগুনিয়ে। ক্ষুধার্ত শিশু একসময় ঘুমিয়ে পড়ে। শুভময় ভালোবেসে শিশুটির ডাকনাম রেখেছিলো Wren, গান গাওয়া ছোট্ট এক বুলবুলির নামে। ঐ ডাকনামটি আজ আর বেঁচে নেই। অনুরাধার বাবামার দেয়া পুরো নামটিই শুধু অনুরাধার অনুমোদন পেয়েছিলো শিশুটির বার্থ সার্টিফিকেটে দেয়ার। সেই নামটিও আজ আর অক্ষত নেই, জন্ম তারিখটিও বদলে গেছে।

অতীনের ভূমিকা বিশেষ ভাবেই দ্রষ্টব্য। তবু শুভময় যেন এক বৃদ্ধের ছানি পড়া চোখে তাকিয়ে দেখে ঠিকঠাক ঠাহর করতে পারে না। মানুষ নাকি মহামানুষ? নির্দ্বিধায় এক যুবক অন্যের শিশুর মলমূত্র, নোংরা কাপড় ধুয়ে দিচ্ছে, মানব ইতিহাসে এজাতীয় ঘটনা কি নজিরবিহীন নয়? শুভময়ের অভিধানে মহামানব শব্দটি কোনদিন ছিল না। কোনো মানুষকেই সে বিশ্বাস করে নি কোনদিন, আজো করে না। শ্রেষ্ঠ মানুষের নাম মনে করতে চাইলে শুভময়ের মনে লাইকা নাম্নী ভুল নামটি-ই কেন মনে পড়ে? এমন কি নিজেকেও খুব একটা ভালো মানুষ ভাবে না শুভময়। অতীনের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া শেষ হয়ে গেলো। পেট্রোকেমিক্যাল এঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিগ্রী নিয়ে অতীন ফিরে গেলো কোলকাতায়।

অনুরাধার যেন সন্তানের জন্ম দিয়েই দায়িত্ব শেষ। শিশুটির দিকে তাকিয়ে চোখে শুধু জল চলে আসে। চোখের জলে দুনিয়ার খুব কম সমস্যারই সমাধান হয়। শুভময় পার্মানেন্ট বেবি-সিটার রাখলো বাড়িতে। পি এইচ ডি শেষ করে সে এখন এক আমেরিকান কম্পানিতে চাকরি করে। অনুরাধা অতীনের সাথে ফোনে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছে। খানিকটা দূরত্ব আছে বলেই বোধ হয় প্রেম এত মধুর হয়, এত আসক্তির হয়। দূরের চাঁদ নৈকট্য পেলে রূপ হারাতো। কর্তব্যের দোষে দুনিয়ায় বরেরা বা বউয়েরা, প্রেমিক বা প্রেমিকাদের মতো নিখাদ হতে কখনই পারেনি সেই প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে। যুগে যুগে অনুরাধা-অতীনরা যেন সেই হ্যামেলিনের বংশীবাদকের সুরের টানে বাধ্য হয়েই ধাবমান নেশার মতো মৃত্যুর দিকে। শুভময়ের অনুরাধাও তাই কোনো ব্যতিক্রম নয়। অনুরাধা তাই অপরাধী নয় কোনো, এমন কি শুভময়ের কাছেও। শুভময়ের রাগ নেই, অভিযোগ নেই, অভিমান নেই, এমন কি বিস্ময়ও আর কোনো অবশিষ্ট নেই। অনুরাধা নির্দ্বিধায় শুভময়ের বুকে মাথা রেখে কেঁদে উঠতে পারে, কারণ অতীন নাকি মারাত্মক অসুস্থ। মাথা ঘুরে নাকি পড়ে গিয়েছিলো। কে জানে ব্রেন টিউমার কি না। অতীনের কিছু হয়ে গেলে অনুরাধা আর বাঁচবে না। প্রেমিকের জন্য স্ত্রীর এই আহাজারি দেখে শুভময় হাসবে না কাঁদবে বুঝতে না পেরে হাসি-কান্নার মাঝামাঝি একরকম মুখ নিয়ে তাকিয়ে থাকলো। ওঠে না কি বুকের ভিতর পেঁচিয়ে ব্যথা? মাঝে মধ্যে ওঠে।

শুভময়ের কাজের বড় চাপ, ঘরে ফিরতে রাত হয়। বেবী-সিটার তখন চলে যেতে পারে। আর অনুরাধা প্রায়ই রাতে ফেরে না। ফিরলেও অনেক রাতে যখন শুভময়ের নাক ডাকছে আর তার বুকের উপর ঘুমিয়ে আছে শিশুকন্যা রেন্। হস্টেলে আরো অনেক বাঙালি আছে, অনুরাধা সেখানেই আড্ডা দেয়। এইসব তুচ্ছ বিষয় নিয়ে কথা তোলার স্টেজ অনেক আগেই পেরিয়ে এসছে শুভময়। অনুরাধার তবে তুচ্ছাতিতুচ্ছ গন্ডির সীমাবদ্ধতা ভালো লাগে না। সে এবার শুরু করলো ঘুমের বড়ি খাওয়া, নিজ শরীরে শিরার ভিতর সিরিঞ্জে বাতাস পুশ করা। অবস্থা চরমে পৌঁছুলে শুভময় সত্যি ভয় পেয়ে গেলো। এরকম মানসিক অবস্থায় চরম কোনো দুর্ঘটনা অনুরাধা ঘটাতে পারে বলেই শুভময়ের বিশ্বাস। আর্থিক দিক দিয়ে কষ্ট হলেও শুভময় টিকিট কিনে ওদেরকে তুলে দিলো কোলকাতার প্লেনে। প্লেনে ওঠার সময়ও অনুরাধা অস্বাভাবিক থাকলো। তার সাথে শিশু। বিমানবালাদেরকে বিশেষ অনুরোধ করতে হলো শিশুটির দিকে বিশেষ নজর রাখতে।

মাস চারেক থাকলো অনুরাধা বাবামার সাথে। ইতিমধ্যে শুভময় পার্সোনাল কম্পিউটার কিনেছে। ব্যবহারিক জীবনের কোনো ঘটনাই বুঝি শুভময়কে কোনো শিক্ষা দিতে পারলো না। অনেক যুক্তিই মেনে নিলো না মন। ইচ্ছে করলো শুভময়ের, অনুরাধাও কম্পিউটার শিখুক। তখন হয়তো তাকেও একটা চাকরি জুটিয়ে দেয়া যাবে। কোলকাতায় ফোন করলো শুভময়, কথা হলো বউয়ের সাথে, শাশুড়ির সাথেও। অনুরাধার বর্তমান মানসিক স্বাস্থ্যের কথায় শাশুড়ি জানালেন তিনি সেরকম কোনো সমস্যাই দেখেন নি। অনুরাধাও জিজ্ঞেস করলো সে কি করবে। শুভময় বললো চলে আসতে, এসে কম্পিউটার শিখতে এবং কাজ খুজতে। অনেক ঠাট্টাও হলো যা হয় বর-বউয়ের মধ্যে। অনুরাধা ফিরে এলো। ফিরে এলো রেন্। শুভময় খুব সুখে আছে। এরকম সুখে থাকা দিন সাতেক।

হাসিরাশির দিন ফুরোলো। শুরু হয়ে গেলো আবারও অনুরাধার। সে শুধু কাঁদে। কি হয়েছে জিগ্যেস করলে তার কোনো উত্তর দেয় না। মাঝে মধ্যে কাগজে কিসব লেখে ও। একদিন শুভময়ের চোখে পড়লো, অনুরাধা লিখেছেঃ আমি আর সহ্য করতে পারছি না, বাবা মা'র নতশির হয়ে থাকা ওই পশুটার সামনে। এরকম কিছু লেখা। শুভময় জিজ্ঞেস করলো কি ব্যাপার খুলে বলো, কিছু একটা নিশ্চয়ই করা যাবে।

-না যাবে না, তুমি পারবে না
-কেন পারবো না?
-তোমার শারিরীক, আর্থিক, সামাজিক কোন শক্তিই নেই তার সামনে।

এর বেশি কিছুই বললো না। এর বেশি কিছু আজো জানা হয় নি শুভময়ের। অনুরাধার মানসিক অবস্থা প্রতিদিন খারাপ হতে থাকলো। গলায় ওড়না পেঁচিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে, প্রচুর ঘুমের বড়ি খেয়েছে। সিরিঞ্জে বাতাস পুশ করেছে শিরায়। নিরুপায় হয়ে ইমারজেন্সি হেল্প চাইলো শুভময়। ডাক্তাররা দীর্ঘ সময় কথা বললেন অনুরাধার সাথে একাকীত্বে। পরে তারা শুভময়কে জানালেন তার মানসিক অবস্থা বিপজ্জনক। শুভময়কে সাবধানতা অবলম্বন করতে বলা হলো। তবে কি মানসিক হাসপাতালে ভর্তি করাতে হবে? কিন্তু অনুরাধা যাবে না কিছুতেই। শুভময় নিরুপায়। শুধু আশা করে আছে, এরকম তো আগেও বহুবার হয়েছে, কেটেও গেছে।

দু'তিন দিন পর। এক বাঙালীর জন্মদিন। ওদের যাওয়ার কথা। অনুরাধা শাওয়ার নিল। খুব সাজলো। এবং কিছু না বলে বেরিয়ে গেল। এরকম সে আগেও করেছে। শুভময় তার শিশুকন্যা নিয়ে হস্টেলের সামনে অনেকক্ষণ হাঁটাহাটি করে অনুরাধা আসছে না দেখে ফিরে এলো চারতলায় ওদের ঘরে। শুভময় টিভি অন্ করেছে, কি যেন একটা ফিল্ম হচ্ছে টিভিতে । হঠাত কাঁদতে কাঁদতে ওদের দরজায় কড়া নাড়লো একটি ছেলে – সে জানালো অনুরাধা মারা গেছে। শুভময়ের মাথা ঘুরে উঠলো। সিঁড়ি দিয়ে নামতেই এক যুবক ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের কার্ড দেখিয়ে ওদের ঘরের চাবি চাইলো। শিশুটিকে কে যেন শুভময়ের বুক থেকে নিয়ে গেল। শুভময় প্রায় পাগলের মতো নীচে নেমে এসে দেখলো অনুরাধার মৃতদেহ পড়ে আছে রাস্তায়। কে একজন বললো, সাত তলা থেকে লাফ দিয়েছে।

পোস্ট মর্টেম হলো। টিকিট করা হলো। তিনবছরের শিশু কন্যা বুকে নিয়ে স্ত্রীর কফিনসহ শুভময় কোলকাতায় পৌঁছুলো। শুভময়ের শ্বশুর শোকের বদলে তার বিভিন্ন ক্ষমতার বিবরণ দিতে থাকলো। শুভময়ের জন্যই অনুরাধার মৃত্যু হয়েছে সেটাই বারবার প্রকাশ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। একদিন কথায় কথায় শুভময়কে শুনিয়ে তিনি বললেন, দুনিয়াটা বড় নোংরা হয়ে গেছে। শুভময়ের শিশুকন্যাটিকে ফেরত দেওয়া হলো না। এই বাচ্চাটিকে বাবার স্নেহ ভালবাসা থেকে বঞ্চিত করেও মানুষ কোন লজ্জা বোধ করেনা উচ্চারণ করতে, দুনিয়াটা বড় নোংরা হয়ে গেছে। শুভময় ফিরে এসেছে কর্মস্থলে। তাকে ডেকে ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের অফিসার কিছু কথা বলেছেন। সে ভীষণ লজ্জার

কথা । শুভময় সেসব কথা কোথাও বলতে চায় না। তার কন্যা সন্তান বড় হচ্ছে। অনুরাধা সাত তলা থেকে লাফ দেয়ার সময়, রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়া দুজন বাঙ্গালী এবং আরো অনেক পথচারীর সংগে কথা বলে লাফ দিয়েছে দিনের আলোয়।শুভময়কে খুনের দায়ে বাঁচানোর জন্যই কি অনুরাধার এই সাক্ষী রেখে যাওয়া?

শুভময় ভাল নেই। সারাক্ষণ মেয়ের কথা ভাবে। বিগত স্ত্রীর কথা ভাবে। কোন ব্যথাই আর অনুভব করতে পারে না। শুভময় ভাবে। মাকড়সার মতো এই জাল বুনে যাওয়া, ভাবনা জালে রহস্যের নদী থেকে কোনো মাছই ধরা পড়ে না। এমনকি কোনো ইঙ্গিতের ছিটেফোটা ডালপালাও উঠে আসে না শুভময়ের ভাবনা জালে। কেন এই আত্মহত্যা? কেইবা সেইজন যার অসীম শক্তি, যার সামনে অনুরাধার বাবামা নতশির থেকেছে? কিইবা ছিল তার সাথে অনুরাধার সম্পর্ক? সাইকোসিস-ই কি একমাত্র কারণ? রেন্-কে বাবার বুক থেকে ছিনিয়ে নেয়ার রহস্যটাই বা কি? প্রাণের বদলে প্রাণ? শুভময়ের প্রাণটাই যুক্তিযুক্ত হত বেশি। কি অপরাধে রেন্ অপরাধী? খুনই যদি হয়, তবে খুনের বদলে খুনই হত। হাজার হাজার ঘরের বউ প্রতিবছর ভারতে আত্মহত্যা করছে বা নিহত হচ্ছে, সেকারণে কোনো কোর্ট একটি শিশুকে দাদামশাই দিদিমার কাস্টডিতে দেয়ার রায় দিয়েছে শুভময়ের জানা নেই। শুভময়ের বাবামা এখনো জীবিত। খুনি প্রমানিত হলেও শিশুটির কাস্টডি তাঁরাই পেতেন। কোর্টের কথায় অনুরাধার বাবামা পাশ কাটিয়েছে। কেন এই পাশ কাটানো? অনুরাধার বাবামার এই নিজ হাতে আইন তুলে নেওয়া নিতান্তই সহজ সরল রেখার মতো কখনই মনে হয়নি শুভময়ের। তোমার কাছেই আমরা আমাদের সক্ষম সন্তান হারিয়েছি, সে কারণেই তুমিও মেয়ের উপর অধিকার হারাচ্ছ। মেয়েটি তোমার কাছে সেফ্ নয়। তবে ভরণ পোষণের দায়িত্বটা রাখো। এভাবেই তুমি অনুতাপের সুযোগ পাচ্ছ শুভময়। এই কথাগুলোই অনুরাধার বাবামা তাকে বারবার জানিয়েছে। অনুরাধার বাবামার এই সরল অঙ্কটি কতকাল দীর্ঘায়ু পাবে শুভময়ের জানা নেই। শুধু জানা আছে যা কিছুর শুরু আছে তার নিশ্চয়ই শেষও আছে। এ গল্পেরও শেষ হবে একদিন এই কথা মনে রেখে হেঁটে যায় শুভময়।

যেখানে চাকরি করতো শুভময় সেই কম্পানীটি বন্ধ হয়ে গেলো একদিন। ভাঙ্গনের পর প্রাক্তন সোভিয়েত দেশগুলোয় ব্যাঙের ছাতার মতো পশ্চিমী কম্পানী গজিয়েছে। ঐসব কম্পানীতে চাকরির আশায় রুশভাষী তরুণ তরুনীদের ভিতর ইংরেজি শেখার হিড়িক পড়েছে। শুভময় এখন ফুল-টাইম টিউটর। অস্ট্রেলিয়া এবং ক্যানাডায় ইমিগ্রেশনের জন্যও আবেদন করেছে। আবেদনপত্রে রেন্ অন্তর্ভুক্ত। এক নাছোড় স্বপ্ন তার অন্তর্গত রক্তের ভিতর খেলা করে। একদিন দুদেশই প্রায় একসাথে আবেদন মঞ্জুর করলো। অন্য আর একদিন অনেক বাক বিতন্ডা শেষে শুভময় ব্যর্থ হলো অনুরাধার বাবামার একটানা জেদের কাছে। রেন্ পড়ে রইলো তৃতীয় বিশ্বে। তাকে কিছুতেই আসতে দেয়া হলো না বাবার কাছে। শুভময়ের মনে এক অদৃশ্য মাকড়সা বুনে চলে ঘন থেকে ঘনতর জাল, সেই জালের ফুটো দিয়ে বরাবর পালিয়ে যায় রহস্যের ছানা-পোনা।

ক্যানাডাই বেছে নিলো শুভময়। টাকা পয়সাও খুব একটা নেই, আছে শুধু একগাদা ডিগ্রী। ফরাসিভাষী প্রদেশ কোবেক এই দরিদ্রদের জন্য দাতা হাতেমতাই। ফরাসী শিখতে রাজি থাকলে কোবেক সরকার ইমিগ্র্যান্টদেরকে কিছু টাকা পয়সাও দেয়, তাতে বেশ ভালই চলে যায়। বছর খানেক এই ফরাসী ভাষা শিখে বেশ কাটিয়ে দিলো শুভময়।

অল্প সময়েই শুভময় বুঝলো এদেশে শ্রমবাজারে বিরাজমান বিশাল এক আমলাতন্ত্র। শুধু যোগ্যতায় যোগ্য চাকরি সে কখনই পাবে না। রাশিয়ার ডিগ্রী নিয়ে নাক সিটকানোই যেন সত্যতা প্রতিপাদক এক কাজ, অর্ধ শিক্ষিত বা অশিক্ষিত লোকও খুব হেসে ফেলে। মানুষের এই ক্রমবর্ধমান সেন্স অব হিউমার দেখে শুভময়েরও খুব হাসি পায়। কিছু হাসিরাশি না থাকলে তার জীবনতো নির্ঘাত বৈচিত্র হারাতো। শুভময় নিশ্চিত এখানে তার সেরকম কিছু হওয়ার নেই। সেরকম কোনো ভবিষ্যত তার জন্য পড়ে নেই বিশাল আর ধনী এই দেশটিতে।

তারপরও এই নির্ঝঞ্ঝাট প্রথম বিশ্বই তার ভালোলাগে। ভবিষ্যত না থাকুক এখানকার বর্তমানটা চমতকার। তাছাড়া শুভময় মহাত্মা গান্ধীর মতো নির্ভিক এক সৈনিকও নয়। শ্বেতাঙ্গ মোমের আলোয় এই ধীরস্থির পথ চলা মন্দ লাগে না তার। এই 'প্রথম-বিশ্বের' লেখাপড়াটাই একবার খুঁচিয়ে দেখতে চাইলো শুভময়, তাছাড়া সময়টাও বেশ কেটে যাবে। রাশিয়া থেকে যারা আসে তারা সাধারণত বছর খানেক ব্যয়ে বড়জোর একটা মাস্টার্সই করে। তাতেই বেশ চাকরি টাকরি হয়ে যায়। এইসব চাকরিতে বাদামি বাঙালিরা এক নির্দিষ্ট সীমার উপরে একটুও খুব একটা উঠতে পারে না, ক্রীতদাসত্বও মেনে নেয়া আছে সেখানে। তা সে যাই হোক খানিকটা বাড়তি শ্বেতাঙ্গ সান্নিধ্য, ব্যাঙ্ক থেকে বিস্তর ধার কর্য করে একটা বাড়ি কেনা, একটা গাড়ি কেনা, আর আছে মাসান্তে একটা পার্টি দিয়ে যারা এতটা উচ্চতায় উঠতে পারে নি তাদের সামনে পশ্চিমী আনুনাসিক ইংরেজিতে আহ্লাদে বলে ওঠাঃ ইটস ওনলি ন্যাউ দ্যাট আ'এম এন্জয়িং লাইফ। মোটামুটি এরকমই হয় প্রবাস জীবন। শুভময় এসবের কিছুই চায় নি। সে দ্বিতীয় বারের মতো পি এইচ ডি তেই ভর্তি হলো। বিরাট কিছু হওয়ার জন্য নয়, শুধু একটু বাড়তি সময় ধরে ছাত্র থাকার জন্যই বুঝি। অনেকেই খুব নাঁকি সুরে বললো বটে, শেষ করতে পারবে না পি এইচ ডি। আর পারলেও চাকরি টাকরি পাবে না। শুভময়কে নিয়ে আর দশজনের দুশ্চিন্তা বুঝি কখনই যাওয়ার নয়।

মেয়ের কথা এখনো খুব ভাবে শুভময়। ফোনে কথাও হয় মাঝে মধ্যে। টাকা পয়সাও পাঠাতে হয়। বারবার ছবি চেয়ে মেয়ের একটাও ছবি পায় না শুভময়। সেই যখন তিন বছর বয়স ছিল তখনইতো শেষ দেখা। সাত বছর হয়ে গেলো মেয়েকে দেখেনি শুভময়। কে জানে এতদিনে মেয়েটা কেমন দেখতে হলো? ছবির কথায় অনুরাধার বাবামা পাশ কাটায়, টাকা পয়সা ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ে কথা বলতে রাজিই নয় তারা। সাফ জানিয়ে দেয়, মেয়ের খোঁজখবর রাখা শুভময়ের একক দায়িত্ব। এসব শুভময়ের সমস্যা, তাদের নয়।
শুভময়েরই যখন সমস্যা, তবে তাই হোক। কোলকাতার টিকিট কিনলো শুভময়। সে কোলকাতায় ফোন করে।

৪ঠা জুন, ২০০৩। কথা হয় অনুরাধার মায়ের সাথে। পাকা এক ঘন্টা ফোনে কথা হলো। ঠিক কথা নয়, ঝগড়া-ঝাটিই হলো বলতে হয়। আর যদি কোনো চেষ্টা চলে মেয়ের সাথে দেখা করার, এবারের সংগ্রাম - অনুরাধার মা শুভময়কে ধূলিস্মাত করে তবেই ছাড়বে। গোটা ভারতবর্ষ ঝাঁপিয়ে পড়বে শুভময়ের উপর। যাহ্ তারা! টিকিট ফেরত দিয়ে পুরো টাকাটা ফেরত পাওয়া গেলো না বটে। কোলকাতা যাওয়া বন্ধ হলো।

পিতৃত্ব কি মাতৃত্বের চেয়েও আসক্তিজনক? হতে পারে নিশ্চয়ই। জটিলতা থেকে কিছুদিন দূরে থাকার চেষ্টা, তারপর বারবার ফিরে যাওয়া। সন্তানের মুখের মতো আর কোনো চুম্বক আছে? যাহোক এই মাঝে মাঝে ফোনে কথা বলা সন্তানের সাথে, এই বা মন্দ কি? একদিনের রেন্ নাম বদল করে এখন অহনা, জন্মের তারিখটাও বদল করা হয়েছে। অহনা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়ে। মাসে মাসে ভরণ-পোষণ এবং লেখা পড়ার খরচের বদলে শুভময়ের বড় ইচ্ছে ছিল স্কুল থেকে সে মেয়ের প্রোগ্রেস রিপোর্ট পাক। সে কথায় অনুরাধার বাবামা পাশ কাটিয়েছে। শুভময়ের কোনো কথার গুরুত্ব নেই তাদের কাছে। শুভময়ের পাঠানো টাকা পয়সা ছাড়া আর কোনো বিষয়ে তারা আগ্রহী নয়। অহনার জীবনে, স্কুলে, সমাজে আসল পিতৃপরিচয়টিই বা কি শুভময় নিশ্চিত জানে না।

এ কথায়, সে কথায় একদিন অহনা ফোনে তাকে বললোঃ পাপা, তুমি মায়ের একলক্ষ টাকার ধারটি শোধ করবে কবে? শুভময়ের মনটা বড় ব্যথিত হলো। ব্যথিত হলো এ জন্য নয় যে তাকে একলক্ষ টাকা দিতে হবে। ব্যথিত হলো এই ভেবে যে নিজেরই সন্তানকে দেয়া সামান্য টাকা, সেই সন্তানের মৃত্যুর পরও যারা ফেরত চাইতে পারে তারা কি মানুষ? টাকা পয়সার প্রাচুর্য শুভময়ের কোনদিনই ছিল না, তবু পরিচিত একজন ডাক্তার ভদ্রলোকের মাধ্যমে অবিলম্বে এক লক্ষ টাকা পাঠিয়ে দিলো। ডাক্তার ভদ্রলোকের সাথে এ কথায় সে কথায় অনুরাধার বাবার একটি নাতিদীর্ঘ শোডাউনও হয়ে গেলো।

শুভময়ের বাবার ক্যান্সার ধরা পড়লো ২০০৫ সালে। মনটা বড় খারাপ তার। সারাজীবন অন্যের জন্যই করে গেলো শুভময়, বাবামাকে কার্যত কিছুই দিতে পারেনি। একটু শান্তি, তাও নয়। ২২শে জুন, ২০০৫ কোলকাতার প্লেনে উড়াল দিলো সে, বাবা হাসপাতালে আছেন। চোদ্দ দিন হাসপাতাল ঘরেই বাবার পাশে কাটালো শুভময়। অহনাকে, তার দাদামশাই দিদিমাকে খবর দেয়া হলো, শুভময় এখন কোলকাতায়, তার বাবা হাসপাতালে মৃত্যুর সাথে লড়ছেন। বাবা এবং মৃত্যুপথযাত্রী ঠাকুর্দার সাথে শেষ দেখা করার প্রয়োজন বোধ করলো না অহনা। অহনার দাদামশাই এবং দিদিমা তাকে নিয়ে দূরের কোনো শহরে চলে গেলো, পাছে শুভময় মেয়েকে নিয়ে টানাটানি করে এই ভয়ে। ৮ ই জুলাই ফেরত প্লেনে শুভময় কোলকাতা ত্যাগ করে।

২০০৬ সালে শুভময় তার দ্বিতীয় পি এইচ ডি অর্জন করলো সিভল এঞ্জিনিয়ারিংয়ে, বাবা মারা গেলেন এবং চাকরি নিয়ে সে আমেরিকা চলে গেলো। বছর চারেক ওখানেই থাকা, তারপর ফিরে আসে টরন্টো। অহনার সাথে ই-মেইলে যোগাযোগ হয়। ফেসবুকেও নিয়মিত কথাবার্তা হয়। বাবার প্রতি অভিযোগ অনুযোগ আর টাকা পয়সা চাওয়া ছাড়া অহনার সেরকম আর কিছু বলার নেই। আর দশজন ছেলে মেয়ের মতো ফেসবুকে অহনার কোনো ছবি নেই। বড় দেখতে ইচ্ছে করে সন্তানের মুখ। অনেক অনুনয় বিনয় শেষে যে দু'চারটে ছবি অহনা পোস্ট করলো তা তার শিশু বেলার।

একদিন শনিবার এলো, একদিন শনিবার গেলো। কে যেন বলেছিলো শনিবারের রং সবুজ। শনিবার শেষে রবিবার এলো। নিঃসঙ্গ বাসভূমে শুভময়ের এই এক আন্তর্জালে সুতোর পথ ধরে হেঁটে ফেরা, নির্বাসনের মতো আপনার মনে নিতান্ত একাকী। ফেসবুকের পাতাগুলো হাওয়ায় ওড়ে, কাপাস তুলোর মতো উড়ে যায়, উড়ে আসে। কে যেন ভুল করে অহনার বর্তমান ছবি অহনাকে ট্যাগ করেছে। প্রাণ ভরে শুভময় দেখে অহনার ছবি, এ যেন বিশ্বরূপ। মুখের উর্ধাংশ ঠিক মায়ের মতো, অনুরাধার চোখ, কপাল, ভ্রু, দৃষ্টি, ঠিক যেন ফটোকপি। নাক ঠোঁট হাসি আর থুতনি অতীনের।

আজ রবিবার। শনিবারের রং সবুজ, রবিবারের রং কিগো?
রংধনু.....রংধনু।

২

রংধনু কোনো আনন্দের প্রতীক নয় শুভময়ের কাছে। দুনিয়ায় সব সুখী মানুষই সাদামাটা একরঙ্গা। সম্ভাব্য সাতটি রঙের সহবাস শুধু অসুখেই, সম্ভাব্য সব ক'টি দৃশ্যমান তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোক বর্ণালী শুধু বিষাদেরই বিষ। রবিই ভূমন্ডলের একমাত্র আলোর উতস – রবিবারের রং তাই রংধনু, প্রতিবারে তাই রবিবার এসে গেলে মনে বড় ব্যথা পায় শুভময়।

অহনার সাথে সর্বমোট ৫৪ বার ই-মেইল আদান-প্রদান হয়েছে। ডিসেম্বর ২০, ২০০৯, রবিবার - প্রথম চিঠি। প্রেরকঃ অহনা – প্রাপকঃ শুভময়। জানুয়ারি ৩০, ২০১১, রবিবার – শেষ চিঠি। প্রেরকঃ শুভময় – প্রাপকঃ অহনা। রবিবার থেকে রক্ষে নেই যেন।

শেষ চিঠিখানা শুভময়ের লেখা। চিঠি ঠিক নয়, নিরুত্তাপ একটিমাত্র শব্দে চিঠির প্রাপ্তি স্বীকার। তবে অহনা কিন্তু তার শেষ চিঠিখানায় দারুণ নাটকীয়তা দিতে পেরেছিলো।

অহনার শেষ চিঠিঃ বেশ, বাস্তবিক দ্রুতই হলো, খোলাখুলিও বটে। তুমি যদি আমাকে সাহায্য করতে না চাও, তাহলে পুরোপুরিই আমার জীবন থেকে বের হয়ে যেতে পারো। ভেবোনা আমাদের সম্পর্কটি স্থাপিত ছিল যে ভিত্তির উপর তা অর্থ। তা নয়। তবে সব ক'টি দিক থেকেই বাবা হিসেবে তুমি ব্যর্থ। তুমি নিঃস্ব ছাড়া আর কিছু নও যার সম্ভবত অনেক অর্থ আছে, যশ আছে, বন্ধু আছে ... তবে কন্যা নেই। এটা নিতান্তই

একটা পরীক্ষা ছিল যে পরীক্ষায় তুমি ঠিক এই মুহূর্তে অকৃতকার্য হয়েছ। তুমি ব্যর্থ হয়েছ বাবা হিসেবে। আমি মরে যাবো না তোমার অর্থ ছাড়া। আমার অনেক মানুষ আছে এখানে যাদের সঙ্গে আমার রক্তের সম্বন্ধ নেই, তবু তারাই আমার কাছে 'বাবা'। তুমি খুব ভালো করেই জানো আমি আইনত আমার অধিকারের দাবি করতে পারি। ডঃ শুভময়, আশা করি তুমি ভুলে যাওনি আমি আইনের ছাত্রী। তবে তুমি ইতিমধ্যেই এক নিঃস্ব, দুস্থ,যে বস্তুত নিজের অহমিকা পরাভূত করতে অক্ষম। আমি তোমার দীর্ঘায়ু কামনা করি, এতটাই দীর্ঘ যেন তুমি দেখে যেতে পারো অহনা তোমার চেয়ে অনেক অনেক ভালো এক অবস্থানে অবস্থিত। তুমি কখনই হতে পার নাই একজন পুত্র, একজন পতি, একজন ভ্রাতা, অথবা বস্তুত কোনো কিছুই ... কারণ তুমি একজন পুরুষ যার অহমিকা ছাড়া আর কিচ্ছুটি নেই।

চিঠিটিতে কোনো সম্বোধন নেই, মুখবন্ধ নেই, সমাপ্তিকরণ নেই, সত্ত্বপ্রদান নেই। এই অনুপস্থিতিগুলোও অর্থহীন হয় নি, এই অনুপস্থিতিগুলোও বেশ এক ধরনের নাটকীয় প্রতিমূর্তি তৈরী করতে পেরেছে বৈকি। কাঠামোগত দিকটা বাদ দিলেও অহনার চিঠিতে ইংরেজিটা নির্ভুল নয়, ভারতবর্ষে শিক্ষার এই অধঃপতনে শুভময়ের মনে বড় ব্যথা পায়। একটা সময় ছিল, বাঙালিরা মাতৃভাষার মর্যাদা বুঝতো, দ্বিতীয় কোনো ভাষা শিখতে হলে তাও খুব ভালো করে শিখতো। এই সময় আর সেই সময় নয়। লেখা পড়া শেখাটাই আজকাল এক নির্বুদ্ধিতা হিসেবে গণ্য হচ্ছে। ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলোতে বাঙালি সাহেবরাই, যাদের মাতৃভাষা ইংরেজি নয়, আজকাল দুর্দান্ত ইংরেজি শেখাচ্ছে। পরিণামে ছেলেমেয়েরা যা শিখছে তা ভয়ঙ্কর। যাহোক, অহনা কিন্তু দারুণ লিখেছে - য়্যু ক্যান্ গেট আউট অব মাই লাইফ ....শুভময় কি আদৌ অহনার জীবনের কোথাও সেরকম ভাবে আছে যে সেই স্থান পরিত্যাগের দুঃখে তার হৃদয় দ্বিখন্ডিত হবে? অহনার কথাগুলো সত্যি হলেই শুভময় খুশি হত বেশি, সম্পর্কটা অর্থ-প্রধান না হলেই ভালো হত। ভালো হত অহনার জন্যই। শুভময়ের অর্থ, যশ, বন্ধু, কন্যা, কিচ্ছুটি নেই – তা ঠিক। 'হে দারিদ্র্য, তুমি মোরে করেছ মহান /তুমি মোরে দানিয়াছ খ্রীষ্টের সম্মান।'

ব্যর্থ বাবা খেতাবটিও মন্দ নয়, বিশেষণটি যাই হোক, ঐ বিশেষ্যটি শুভময়ের একদিন বড় কাঙ্খিত ছিলো।
রক্তের সম্বন্ধ কথাটারও কোনো মানে হয় না, পৃথিবীজোড়া সব মানুষই হয়তবা একদিনের সেই এক রক্তের বন্ধনে পরস্পর আবদ্ধ। আবার কারো সাথেই হয়তো কারো আদৌ কোনো বন্ধন নেই। মানুষ মানেই রক্ত মাংস শরীর শুধু নয়, মানুষ মানে আত্মাও। সেই আত্মার সৃষ্টি, আদি, উতস, বিভাজন মানুষ বড় জানে না। অহনার সাথে রক্তের বন্ধন শুভময়ও দাবি করে না, বন্ধনের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি কোনটা আবিষ্কারের প্রতি তার নিজের সেরকম কোনো আগ্রহও নেই। তবে কৌতুহলী জনের জন্য বিশেষ দ্রষ্টব্য এই যে প্রাগ্রসর বিজ্ঞানের সুবাদে কমপ্লিট ডি এন্ এ প্যাটারনিটি টেস্ট এখন সহজলভ্য, সাধারণ কৌতুহল অথবা আইন সংক্রান্ত জটিলতা নিবারণের বাজার দর এখন $৭৯ মার্কিন ডলার। আধুনিক আইন আজ আর শুধুই কথা-বলা-কলা-কৌশল নির্ভর নয়, বিজ্ঞান-প্রযুক্তিই এখন এক অপরিহার্য বিচারক হয়ে উঠেছে।

অহনা ভালো একজন আইনজীবী হয়ে উঠতে পারলে শুভময়ই একদিন খুব খুশি হবে। অতটা আশা করার সাহস যদিও শুভময় করে না, কারণ অহনার মেধা নেই। অন্তত শুভময় তাই মনে করে। অপরাধী বাবাকে শাস্তি দেবার জন্য আইনজীবী হওয়া বেশ নাটকীয় দেখালেও বাস্তবানুগ নয় মোটেও। বরং একজন দক্ষ আইনজীবী ভাড়া করার কথাটা মাথায় আসলেই অহনাকে বুদ্ধিমতি বলা যেত।
যুদ্ধ বাধলেই বুদ্ধি দিতে আসা মানুষের অভাব পৃথিবীতে নেই, সে কারণেই অহনার পিতৃসম মানুষের অভাব নেই। এই সব বাবারা যদিও প্রয়োজনে বিন্দুমাত্র কাজেও আসে না। কাজে আসলে পৃথিবীটা আরো একটু বেশি বাসযোগ্য হত। কাজে আসলে অহনার জীবনটা আজ

নড়বড়ে বাশের সাঁকোর মতো না হয়ে শক্ত রেললাইনের ব্রীজের মতো দেখাতো।
অহনার এই নাটকীয় ভাবে শুভময়ের দীর্ঘায়ু কামনা করাটা বেশ উপভোগ্য। আজ খুব মনে পড়ে অনুরাধার শবদেহ সামনে রেখেই অহনার দাদামশাই একটানা বিলাপ করেছিল, অনুরাধার মৃত্যুতে শুভময়েরও কেন মৃত্যু হলো না, বারবার এই বলে। জুলিয়েটের শবদেহ দেখে রোমিও কি নিজ হাতে তুলে নেয়নি বিষ? বাহ্, মানুষের চাওয়ার কোনো শেষ নেই বুঝি। অহনার সেই দাদামশাই আজ নব্বই পেরিয়েছে, সন্তানকে সে নিজের জীবনের চেয়েও বেশি ভালোবাসতো। পৃথিবীর মায়া মমতা ছেড়ে তবু জীবনের সাঁকোখানি পেরিয়ে ওপারে যাবার কোনো লক্ষণই তার ভেতর আজো কেউ দেখেনি। আর দিদিমাও আছে বেশ ঠিকঠাক, আজো ঠিক আগের মতই টেনে টেনে সুর করে দারুণ বাংলা বলতে পারে। কথিত আছে, একদিন তার সেই সুরে কেঁপে উঠে যৌবন ফিরে পেতে দেখা গেছে কত বুড়ো মন্ত্রী-মিনিস্টার আর বুদ্ধিজীবীর হৃদয়। যা রটে তার কিছুটা বটে। অহনার দিদিমার চরিত্রহীনতার রটনা একদিন সত্যই ছিল, সেই সময়ের যে দু'একজন যারা এখনো বেঁচে আছেন, খুকখুক হাসি সামলে তারা সেরকম সাক্ষ্যই দেন।

একদিন অহনা খুব বড় অবস্থানে পৌঁছুতে পারুক এই আশীর্বাদই করে শুভময়, অহনার সাথে তার কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই,শুভময়ের অবস্থান এমন কোনো গগনচুম্বী নয় যে সেই অবস্থান পেরুনো এক দুরাশার মতো শোনাবে। শতায়ু আর ধনে পুত্রে লক্ষীলাভ হোক, আন্তরিক এই আশীর্বাদই করে শুভময়।

পিতা নয়, পতি নয়, পুত্র নয়, ভ্রাতা নয়, কোনো কিচ্ছুই আর শুভময়ের হবার নয় এ পৃথিবীতে অহনার এই প্রজ্ঞাপন বেশ নাটকীয় তবে অবাস্তব। শুভময়ের বাবা মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত পুত্রগর্বে গর্বিত ছিলেন, মা এখনো বেঁচে আছেন, সমাজে দু দশজনকে আজো তাঁর পা ছুঁয়ে প্রণাম করে বলতে দেখা যায় 'রত্নগর্ভা মা, আমাকে আশীর্বাদ করো।' দাদা বা ভাই হিসেবে শুভময়ই ভাইবোনদের কাছে আজো প্রিয়তম। শুভময়ের পিতৃস্নেহবলেই এমনকি অহনার জীবনের প্রথম তিন বছর নিষ্কন্টক ছিল। শুভময়ের পিতৃস্নেহবলেই অহনার আজকের জীবন জটিলতর হয়ে ওঠেনি। শুভময় মুখ খুললে হতো, মুখ সে খোলেনি। অহমিকা নয়, সত্যবাদিতা। এই সত্যবাদিতার কারণেই শুভময়ের নিজের জীবন কন্টকাকীর্ণ, এই সত্যবাদিতার কারণেই তার জীবন পুষ্পের পেলবতা পেলো না।

অহনার এই শেষ চিঠির আগের চিঠিখানা ছিল শুভময়ের, সেটাও সংক্ষিপ্ত একটিমাত্র শব্দে রচিত। 'না।' শুভময় এমন নিস্প্রাণ চিঠিই বা লিখতে গেলো কিসের উত্তরে?

অহনার চিঠিঃ পাপা, নমস্কার। কেমন আছো? তুমি জানো, আমি সত্যিই ব্যস্ত আমার পরীক্ষা নিয়ে। না, দয়া করে অবাক হয়োনা। আমি তোমার কন্যা এবং আমি তোমার সাথে যোগাযোগ বন্ধ করবো না যতক্ষণ না তুমি আমার কাছে মোটামুটি সহনীয় থাকছো। মূল বিষয়ে ফিরে আসছি। আমি নির্দিষ্ট করে তোমার পূর্ববর্তী চিঠির উত্তর দিচ্ছি তা নয়, কারণ সেইসব বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করার জন্য আমাক আরো ভেবে বের করতে হবে সম্ভবত অতিপ্রাকৃত শব্দাবলী, খোলামেলাভাবে বলতে গেলে সেইসব বিষয়বস্তু মনে হয় না তুমি আদৌ বুঝতে পারো। ঠিক আছে, খুলে মেলেই বলছি, আমি চাই এখন থেকে তুমি আমাকে নিয়মিত মাসিক ভাতা দাও। এটা কি সম্ভব হবে? দয়া করে জরুরি ভিত্তিতে আমাকে জানাও। এখন চলি। অহনা।

জরুরি ভিত্তিতেই অহনাকে প্রশ্নটির উত্তর জানিয়েছিলো শুভময়। তাতক্ষণিক, নিশ্চিত, সহজ, সরল, সংক্ষিপ্ত ছিল সেই উত্তর। অহনার এই চিঠির পর শুভময় মাত্র দুবার উত্তর পাঠিয়েছে, দুবারই সংক্ষিপ্ত উত্তর। তারপর অহনা আর যোগাযোগ রাখেনি। তাহলে সামান্য এই এক 'না' শব্দটিই কি অহনার কাছে সহনাতীত হয়ে উঠলো? শেষ

চিঠিতে অহনা লিখেছিলো বটে ‘ভেবোনা আমাদের সম্পর্কটি স্থাপিত ছিল যে ভিত্তির উপর তা অর্থ।’ অহনা ঠিক লেখেনি। অর্থের প্রশ্নে নিষ্পাপ এই ‘না’ শব্দটিই জগতের অধিকাংশ সম্পর্ককে ভেঙ্গে চুরমার করে দেয়। এটাই সত্য, এটাই বাস্তব। পিতা-মাতা-সন্তান, ভাই-বোন, পতি-পত্নী -জগতের কোনো সম্পর্কই এই টাকা-পয়সার চৌম্বক ক্ষেত্রের বাইরে নয়। জগতে এই টাকা-পয়সা উপার্জন করা একই সাথে খুব কঠিন এবং খুব সহজ। টাকা-পয়সার এক ধরনের হৃদয় আছে, যা স্পর্শ করতে পারা এক শিল্পবিশেষ। কেউ কেউ জানে, কেউ কেউ জানে না সেই শিল্প, সেই কলা। অহনা জানলে শুভময়ের বড় ভালো লাগতো।
ডিসেম্বর ২৩, ২০১০, অহনাকে পাঠানো শুভময়ের উত্তর। শুভময় অহনার লেখা চিঠিটিকে পুনর্বিন্যাস করেছে - অক্ষরগুলো লালরঙ্গা, ছোট বড় বারো ভাগে বিভক্ত হয়েছে অহনার চিঠি, প্রতিটি খন্ড অংশের নীচে নীল অক্ষরে টাইপ করা শুভময়ের উত্তর।
-হাই পাপা,
-হাই মাই ডটার!
-ধন্যবাদ তোমার অবিলম্বে উত্তর দেবার জন্য। আমার প্রথম প্রশ্ন আমাকে বিদ্রোহী নামে ডেকেছ কেন। আবারও তুমি মানুষকে অভিযুক্ত করা চালিয়ে যাচ্ছো।ঠিক আছে, আমার এ ব্যাপারে কিছুই করার নেই।
-বিদ্রোহী নামে ডেকেছি এক পিতৃস্নেহ মাখা নিতান্তই ঠাট্টার ছলে, কোনো কিছুতে অভিযুক্ত করার উদ্দেশ্যে নয়।
-প্রথমেই আমি কিছু বিষয় তোমার কাছে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিতে চাই। আমার কাছেও ভালোবাসা বিক্রয়যোগ্য নয়। আর আমি ধারণা করি ম্যাটেরিয়াল বিষয়-আশয় দিয়ে ভালোবাসা অর্জন করা যায় না। আমি তোমার ব্যাপারে জানি না, তবে এটাই আমি ঠিক যেভাবে ভালোবাসাকে দেখি। আমি যদি তোমার কাছে কিছু চেয়ে থাকি, তবে তা তুমিই করতে বলেছো বলে করেছি।
-তুমি খুব ভালো মেয়ে।
- পরিবার বলতে আমি বুঝিয়েছি সেইসব মানুষকে আমার সাথে যাদের রক্তের সম্বন্ধ আছে, বাবা হিসেবে তুমি অন্তর্ভুক্ত। আমি আমার পিতার দিক দিয়ে সম্পর্কযুক্ত আত্মীয়দের নিয়ে কথা বলতে চাই না, কারণ তারা কখনই আমার খোঁজখবর নেবার প্রয়োজনটি বোধ করেনি। অতএব দয়া করে আমার কথাগুলোর অন্যথা-ব্যাখ্যা দিও না।
-সব মানুষই মূলত মানব প্রজাতির এক বিশাল পরিবার। আদৌ রক্ত নয়, পরস্পর সম্পর্কিত হওয়ার জন্য বরং অন্য কিছু জরুরি।সব সত্ত্বেও বাবা হিসেবে আমাকে বিবেচনা করার জন্য ধন্যবাদ, আমি সম্মানিত বোধ করছি, ...আর খুউব সুখী। তোমার পিতার দিক দিয়ে সম্পর্কযুক্ত আত্মীয়রা কখনই তোমার খোঁজখবর নেয়ার প্রয়োজন বোধ করে নি ... শাবাশ! তুমি সঠিক পথটিতেই আছো। আমি বুঝতে পারছি তোমার কথাগুলো, সম্পূর্ণভাবে, পরিপূর্ণভাবে, সম্ভাব্য সব অর্থ বিবেচনা করে। চালিয়ে যাও।
-তোমার মতানুযায়ী, তো কাস্টডি টাই সর্বশেষ কথা!! আমার যদি ভুল না হয়, আমার মা'র মৃত্যুর পরে তো তুমি আমাকে আভিভাবক স্বরূপ এই দাদু-দিদিমার হাতেই তুলে দিয়েছিলে। আমি কন্যা সন্তান। আমার মায়ের প্রয়োজনীয়তা ছিল। আমার দিদিমা সেই শুন্যস্থান পূরণ করেছেন। যাই হোক, তাতে তোমার পিতৃত্বের অধিকার তো আর বিলুপ্ত হয়নি। নাকি আমাকে হস্তান্তর করার সময়েই তুমি তোমার পিতৃত্ব বিসর্জন দিয়েছিলে। আমি আবারো বলছি, তোমার স্নেহ, ভালবাসার প্রতি সংশয় প্রকাশ করছিনা, কিন্তু তোমার আমার দায়িত্ব নেবার ক্ষমতা কে প্রশ্ন জানাই। আর্থিক দিক দিয়ে আমি আমার ভবিষ্যতকে বিপদমুক্ত রাখতে সক্ষম। বর্তমানে, আমি আমার দেশের এক অতি সুপ্রতিষ্ঠিত ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ে পড়ছি। অর্থের ভিক্ষা আমি চাইছি না । কোনোদিন চাইও নি। সমাজের নিরিখে, আমি আমার নিজস্ব দক্ষতায় ভাল মতই স্বাবলম্বী ও সম্মানিয়া।

-হ্যা, নিশ্চয় কাস্টডিই একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমি আদৌ একমত নই তুমি যা বলছো তার সাথে। আমি তর্কও করতে চাই না। কারণ আমি তোমার সাথে কোনো সংঘর্ষমূলক বিরুদ্ধতায় যেতে চাই না। তবে আমি এক প্রাচীনকালীন গল্প বলতে চাই, সেই গল্পের নাম ছিলো অন্ধকারে হাতি দেখা। এই গল্পে হিন্দুস্থান থেকে আসা একদল লোক অন্ধকার ঘরে হাতি প্রদর্শনের ব্যবস্থা করে। কিছু সংখ্যক মানুষ

অন্ধকারে হাতি স্পর্শ করে হাতি দেখতে কেমন বোঝার চেষ্টা করেছিলো, ঠিক কোথায় স্পর্শ করেছিলো তার উপর নির্ভর করে তাদের মধ্যে কেউ মনে করলো হাতি এক প্রকার জল নির্গমনের নল বিশেষ (শুঁড়), আবার কেউ কেউ মনে করলো হাতি দেখতে পাখা (কান), থাম (পা)এবং সিংহাসনের (পিঠ) মতো। এটা পৃথক পৃথকভাবে প্রত্যক্ষকরণের সীমাবদ্ধতার একটি উদাহরণ। আবারো বলছি, কেউই কারো বা কিছুর জন্য দায়ী নয়। আমি খুউব সম্মানিত বোধ করছি নিজের অক্ষমতার জ্ঞান আমার কন্যার কাছেই অর্জন করতে পেরে। ধন্যবাদ! আর দয়া করে আমাদের এই চিঠিপত্রের আদানপ্রদান সংরক্ষণ করে রেখো ভবিষ্যতে পড়ার জন্য, ধরা যাক, এখন থেকে কুড়ি বছর পর যদি তোমার হঠাত অশ্রুপাত করার প্রয়োজন পড়ে। অন্যতম সর্বোত্তম ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ে পড়বার অভিজ্ঞতা নিশ্চয় আকর্ষনীয়, তাই নয় কি? আমি বড় হয়েছি প্রত্যন্ত একগ্রামে, প্রকৃতই জানিনা ইংরেজি-মাধ্যম বিদ্যালয়ে ড়ার অনুভূতিটা কেমন। তবে আমার কাছে খুউব বড় শোনাচ্ছে।আমি তোমার সুস্থিত আর্থিক অবস্থা এবং সামাজিক মর্যাদার জন্য প্রকৃতই সুখী। তোমার জন্যই ভালো, তাই নয় কি?

-না, আমি নিশ্চয় আমার বিয়ের ব্যাপারে তোমাকে জানাবো। নিমন্ত্রণ পত্রের দরকার হবে না বোধ করি। এখানে তোমার কন্যার কথা হচ্ছে। তবে তুমি যদি অন্ধ হয়ে যাও ততদিনে? তুমিতো আমাকে তাহলে দেখতে পাবে না। আমার হাসব্যান্ডের ‘সত্য’ জানাই ভালো। তোমার প্রথম option টাই সমগ্রভাবে সত্যের কাছাকাছি।

- খুউবই সম্ভব আমি অন্ধ হয়ে যেতে পারি ততদিনে। এগিয়ে যাও Honey, যে option টাই তোমার পরিস্থিতির জন্য বেশি স্যুট করে তা নিয়ে। আমি প্রভূত মূল্যের সাথেই গ্রহণ করেছি তোমার মতামত - তুমি প্রকৃত আমার সম্পর্কে কি ভাবো তা বুঝতে সাহায্য করার জন্য ধন্যবাদ।

-বিগত ১৪ বৎসর , আমার কোন কম্পিউটার এর প্রয়োজন হয়নি। শুধুমাত্র তোমার কথা অনুযায়ী, তোমার সাথে যোগাযোগের কারণেই আমার কম্পিউটার এর প্রয়োজনয়ীতা। তোমার ভাই, যাও বা কম্পিউটার আমাকে দিয়েছিল, সবচেয়ে ভাল কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ কে দেখিয়েও আমাকে ওটা আবর্জনায় ফেলতে হয়েছে, বিক্রি টুকুও করা যায়নি। এখন যেহেতু আমি তোমার সাথে যোগযোগ রাখছি এবং বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আবেদন করছি, আমার এটি প্রয়োজন। দাদু-দিদিমা আমার কোন কিছু তেই আপত্তি প্রকাশ করেন না। তাদের তো আমার রক্ষণাবেক্ষণ বৈ আর কিছুই করার ছিলনা, যা কিনা তারা যথেষ্ট পরিমাণেই করেছেন। এটা তো তোমার কর্তব্য ছিল।

- বিগত ১৪ বছর , তোমার কোন কম্পিউটার এর প্রয়োজন হয়নি? হ্যা, তাইতো, তুমি যথার্থ তাই বলছ। আমি তাহলে ক্ষমা মার্জনা করছি আমার সাথে যোগাযোগ রাখতে বলায়, আমার দাদাকেও ক্ষমা করো, যে তোমাকে এক আবর্জনা কিনে দিয়েছিলো যা থেকে মুক্তি পেতে তোমাকে বেগ পেতে হয়েছে। আমি কারো জন্য, বা কোনো কিছুর জন্যই দায়ী নই।

-আমি কখনো ভাবিও নি যে আমাকে এই ভাবে বলতে হতে পারে। আমার সক্ষম মা কিন্ত তাদের জিম্মায় থাকা কালীন মারা যাননি। আমি তাকে হারিয়েছি, যখন সে তোমার কাছে ছিল। যেহেতু, তুমি ভাবছ, আমি এক কঠিন জীবন অতিবাহিত করছি, তার কারণ শুধু এটাই, আমার মা নেই। অবশ্যই, আমার দাদু-দিদিমার কাছে এর উত্তর নেই। তুমিই আমায় বলো, যদি তুমি সত্যই এত কর্তব্যপরায়ন, এতই বিচক্ষণ, কি করে আমার মা কে মৃত্যুর পথে যেতে হল? সুতরাং, যদি আমি আজ এতই দুর্দশার স্বীকার,তোমারই কি নয়, সেই দায়? তোমার কি কোন উত্তর আছে? তাহলে, কিভাবে আমি আমার সুরক্ষা বলয় দেখব বল, ওখানে? আমার পক্ষে এটা বিবেচনা করা সম্ভব ছিলনা, কারণ আমি ছোট ছিলাম। আমি বিবেচনার কথা নয়, তথ্য বা বাস্তব ঘটনার কথা বললাম। আমি এভাবে তোমাকে প্রশ্ন করতে চাইনি, কিন্তু তোমারি কথা আমাকে এরূপ তর্কে অবতীর্ণ করেছে ।

-‘কাস্টডি’ প্রাসঙ্গিক শুধুমাত্র ১৮ বছর বা তার কম বয়সের সন্তানাদির জন্য। স্বচ্ছন্দেই তুমি তোমার হৃদয় খুলে মেলে বলো, হানি। তোমার যা খুশি তাই বলতে পারো। আমার এখন আর তাতে কিচ্ছু যায় আসে না। আমি আগেও বেশ শুনেছি এই একই নিন্দা তোমার পরিবারের

অন্য সদস্যদের মুখ থেকে প্রবাহিত হতে। ছেলেমানুষী। তবে তোমাকে ধন্যবাদ, এ ব্যাপারে তোমার নিজস্ব উপলব্ধি আমাকে জানানোর জন্য। আর একটা সাধারণ উপদেশ দিচ্ছিঃ দয়া করে অন্ধকারে হাতি দেখা গল্পটির কথা মনে রেখো যখনই তোমাকে তথ্য বা প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কে কিছু বলতে হয়। তোমার দাদু-দিদিমার কাছে জিজ্ঞাসা করতে থাকো ... তাদের কাছেই সব উত্তর আছে ... আমি নিশ্চিত ... তারা তোমাকে বলছে না তোমার নিরাপত্তার কথা ভেবেই ... নিশ্চয় গুরুতর কোনো কারণ আছে যে জন্য তারা তোমাকে সত্য বলছে না ... আমি নিশ্চিত তারা তোমাকে ভালোবাসে ... আমি নিশ্চিত তারাও মনে করে 'সত্য' তোমার জন্য কল্যাণকর নয়।

- আমি ফেস্ বুক এ আমার কিছু ছবি আপলোড করে দেবো। তুমি ওখানে আমাকে দেখতে পাবে।

-তোমার অশেষ কৃপা!!!

-আমি তোমার কাছে জিনিসপত্র চাই, কারণ আমি চাই তুমি আমার জন্য অন্তত কিছু করো, ভালোবাসা ব্যতিরেকে নিশ্চয়। তুমি যদি আমাকে ভালোবেসে থাকো, আমিও তোমাকে ঘৃণা করি নি।

-কে জানে, হয়তো আমি কিছুই করি নি তোমার জন্য। এটাই তবে 'সত্যি' হোক।

-দেখতেই পাচ্ছো পিতা-মাতা-সন্তানের ভালোবাসা বিশ্বজনীন।

-সাধারনভাবে বলতে গেলে 'হ্যা'। তবে আমরা এক ব্যতিক্রম। তুমি কি করে আমার মতো একজন ঘৃণ্য মানুষকে ভালোবাসতে পারো?

-বাই! উত্তরের প্রতীক্ষায় থাকবো।

-বাই! তোমার উত্তর পেলে সুখকর বিস্ময়ে আমি নিশ্চয় অভিভূত না হয়ে থাকতে পারবো না।

আগের দুখানা চিঠির তুলনায় এই চিঠিতে বাবা-মেয়ের মধ্যে বেশ বাক্য বিনিময় হয়েছে। অহনার কথাগুলো পরস্পর বিরোধী, নির্দিষ্টভাবে ঠিক এই পরস্পর বিরোধী কথাগুলো শুভময়ের কাছে অতটা গুরুত্বপূর্ণ না হলেও, সাধারণভাবে অহনার 'প্রকৃতি' শুভময়কে ভাবিয়ে তুলেছে। এ বয়সেই যদি শক্ত-সমর্থ প্রকৃতিটি গঠন করে নিতে ব্যর্থ হয়, তবে কবেই বা আর অহনা পারবে? এই প্রকৃতিই মানুষের ভাগ্য বহুলাংশে নির্ধারণ করে থাকে। বক্তব্যে পরস্পর বিরোধিতা ভাবনার অস্থিরতা থেকেই আসে সম্ভবত। প্রযুক্তির এই যুগে অহনার একটা কম্প্যুটার না থাকাটা অপরাধসম, শুভময় তা জানিয়েছে বটে অহনাকে, তবে তা কিনে দেবার প্রতিশ্রুতি সে কখনই দেয়নি। একপা বাড়িয়ে এই একটু অতিরিক্ত বুঝতে যাওয়া শুভময় মনে করে অহনার চরিত্রের বড় এক দুর্বল দিক। একটু বেশি এবং একটু কম বুঝতে পারা-ই সম্ভবত জীবনে সব ব্যর্থতার প্রধান কারণ। চারিত্রিক গুণাবলীর ভেতর শুভময়ের বড় আশা ছিল কৃতজ্ঞতাবোধটুকু অন্তত অহনার থাকুক। যে কম্প্যুটারটি প্রথম অহনাকে কিনে দেওয়া হয়েছিল তা সেই সময়ে কোলকাতার বাজারে যা পাওয়া গেছে তাই, দামও ছিল তখন চড়া। অহনার দাদু-দিদিমা অবশ্য বায়না ধরেছিলো টাকাগুলো নগদ দিতে। শুভময় রাজি হয়নি, সে তার দাদাকে দিয়ে কিনিয়ে দিয়েছিলো কম্প্যুটারটি। ই-মেইলে বাবার সাথে মেয়ের যোগাযোগ রক্ষা অন্যতম উদ্দেশ্য হলেও, শুভময়ের প্রধান উদ্দেশ্যটি ছিল সমসাময়িক প্রযুক্তির সাথে মেয়ের একটি যোগসূত্র শিশুকাল থেকেই তৈরী করে দেয়া। নিজ জীবনে পাওয়া প্রথম কাগজের খাতাটি নিজ হাতে বানিয়ে দেবার জন্য শুভময় আজো তার লোকান্তরিত ঠাকুরদাকে কৃতজ্ঞতা জানায়, অহনা ঠিক উল্টোটি করাই শিখেছে। কৃতজ্ঞতার বদলে এই তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করাটা অনুরাধার পরিবারে শুভময় আগেও দেখেছে। কৃতজ্ঞতাবোধ বিবর্জিত মানুষকে শুভময় মনে করে মানব সৃষ্টির এক বর্জ্য পদার্থ, যথার্থ মানুষ নয়। ব্যক্তিগতভাবে শুভময়ের প্রতি অহনার কৃতজ্ঞতাবোধ থাকুক বা না থাকুক, তাতে শুভময়ের সেরকম কিছু যায় আসে না, তবে সাধারণভাবে অহনার চরিত্রের এই দিকটি এক বিশেষ দুশ্চিন্তার কারণ।

বিশেষ এক প্যাটার্ন চোখে পড়ে, এক নির্দিষ্ট পন্থায় যেন সব ঘটনা পরিবর্ধিত এবং বিন্যস্ত। ঐ যে অহনা লিখেছে, 'পরিবার বলতে আমি বুঝিয়েছি সেইসব মানুষকে আমার সাথে যাদের রক্তের সম্বন্ধ আছে, বাবা হিসেবে তুমি অন্তর্ভুক্ত। আমি আমার পিতার দিক দিয়ে সম্পর্কযুক্ত আত্মীয়দের নিয়ে কথা বলতে চাই না, কারণ তারা কখনই আমার

খোঁজখবর নেবার প্রয়োজনটি বোধ করেনি। অতএব দয়া করে আমার কথাগুলোর অন্যথা-ব্যাখ্যা দিও না।' ঠিক এই কথাগুলোই কি শুভময় শোনেনি অনুরাধার সাথে বিয়ের পর, অহনার তখন জন্মই হয় নি।মনে পড়ে অনুরাধা, অনুরাধার বাবা, মা, দাদা, এমন কি কাজের ঝিও শুভময়কে জানিয়ে দিয়েছিলো শুধু শুভময় ছাড়া ও পরিবারের আর কারো সাথে মিশবার অভিপ্রায় এ পরিবারের কারোরই নাই। শুভময়, একমাত্র তুমিই ভালো, তুমিই ব্যতিক্রমী, তুমি ছাড়া তোমার অন্য কোনো স্বজন আমাদের সমাজের যোগ্য নয়। এটাই একদিন পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছিলো অনুরাধার পরিবার। প্রায় দেড়যুগ পর অহনার চিঠি কি সেই ধ্বনিরই প্রতিধ্বনি নয়? শুভময়ের বাবা যতদিন বেঁচে ছিলেন অহনাকে দেখতে গিয়েছেন শত লাঞ্ছনা, অপমান সহ্য করেও। শুভময়ের ভাইবেনেরাও চেষ্টা করেছে যতটুকু সম্ভব। এই যে বিশেষভাবে শুভময়ের আত্মীয়দেরকে অপমান করা, এ বাড়ির ত্রিসীমানায় আসতে না দেয়া, এই সবের পিছেই কি লুকিয়েছিলো না একদিন বড় হয়ে অহনার মনে পিতৃকূলের বিরুদ্ধে এক তীব্র বিরাগ তৈরী করার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র? এ জাতীয় ষড়যন্ত্রে ক্ষতি ছাড়া কি লাভ হয় কে জানে, তবু এই এক বিকৃতি থেকে কিছু মানুষ মুক্তি পায় না কিছুতেই।

অহনা কন্যা সন্তান, তার মায়ের প্রয়োজনীয়তা ছিল বলেই শুভময় তাকে স্বেচ্ছায় দাদু-দিদিমার হাতে তুলে দিয়েছিলো? আত্মপক্ষ সমর্থন মানুষকে হয়তো খানিকটা অন্ধ বানিয়ে দেয়, আত্মপক্ষ সমর্থন দোষের নয়, তবে মানুষের যুক্তিবোধের বিনষ্টি শুভময়কে পীড়িত করে। শুভময়ের পুনর্বিবাহই যুক্তিযুক্ত হতো অহনার মায়ের শুন্যস্থানটি পূর্ণ করার মতো ব্যাপারটা সহজ হলে। শুভময় নিজে, তার বাবা মা, আত্মীয়স্বজন অনেক চেষ্টা করেছিলো অহনাকে নিজের কাছে রাখতে। অহনার দাদু-দিদিমা সাঙ্গপাঙ্গ ডেকে, নানাবিধ হুমকির মুখে শুভময়কে বাধ্য করেছিলো সাময়িক ভাবে তাদের কাছেই শিশুটিকে রেখে আসতে। অহনা যে তার দিদিমাকে মা বলে ডাকে, সেটাও খুব শ্রুতিমধুর বলে মনে করে না শুভময়। এই সাময়িক তত্ত্বাবধানের সময়সীমা অহনার স্বেচ্ছাচারী দাদু-দিদিমা নিজেরাই ফলত নির্ধারণ করেছিলো। তাদের গোয়ার্তুমির কারণেই শুভময় শত চেষ্টা করেও মেয়েকে নিজের সাথে বিদেশে নিয়ে আসতে পারেনি, পারলে শুভময়ের নয় অহনারই লাভ হতো আজ।

চলবে...

সুখের লাগিয়া

ফিরোজা হারুন

।। এক।।

ছোটবেলায় কবিতা পড়েছিলাম, ‘হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে করব মোরা পরিহাস।’ লাইনটি পড়ে মনে শক্তি সঞ্চয় করতাম।উতসাহ বোধ হতো। ভবিষ্যত জীবনে আমারাও তুড়ি মেরে যা কিছু অশুভ, অশোভন সব কিছু দূর করে এগিয়ে যাব। মানুষের যত দুঃখ, বেদনা, দুর্দশা, যন্ত্রণা – সব মোচন করে মচোন করে সুখ তৈরি করতে সাহায্য করবো। মনে হতো মানুষের অসাধ্য কিছুই নেই। ইচ্ছাই তার প্রধান চালিকা শক্তি।

যাত্রা শুরু করেছিলাম এই ধারণা নিয়ে। চলার পথ যে বাধাহীন, সাবলীল ছিল তাও নয়। সব বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে আনন্দকে সংগী করতে চেয়েছি বারবার। আনন্দ পেয়েছি, আনন্দ বিলিয়েছি চারপাশে। দুঃখ দুঃখ ভাব নিয়ে বাঁচতে ভাল লাগে না আমার। কিন্তু না, অদৃষ্টকে পাশ কাটিয়ে যেতে পারিনি। আনন্দ সৃষ্টির নিরন্তর প্রয়াস আমার বিঘ্নিত হয়েছে। মুখ থুবড়ে পড়েছি বারবার। ভাগ্যের হাতে বড় নির্মমভাবে নিপীড়িত, নিগৃহীত হয়েছি। তবুও উঠে দাঁড়িয়েছি আশায় বুক বেঁধে। অদৃষ্টকে পরিহাস করার সাহস আর নেই। অদৃষ্টই আমাকে পরিহাস করেছে। তাকে মোকাবেলা করাই আমাদের কাজ।

‘মনে পড়ে সেই জৈষ্ঠ্যের ঝড়ের রাত্রে নাহিকো ঘুম, অতি ভোরে উঠি তাড়াতাড়ি ছুটি আম কুড়াবার ধুম।’ ছোটবেলার এ দৃশ্যটি আমার জীবনে এক বাস্তব ঘটনা ছিল। নানার বাড়িতে আমার শৈশব কেটেছে। সবুজ শস্যভরা শ্যামল বিস্তীর্ণ মাঠের ওপারে আম, কাঁঠাল, সুপারি-নারকেলের বাগানে ঘেরা আমার মাতামহের গৃহাঙ্গন। পাশেই জলভরা দিঘী। জল টলমল করছে। শান বাঁধানো ঘাট। মৃদু সমীরণে দিঘীর জলে জেগে ওঠে অসংখ্য ঢেউ। তারই মাঝে টুপটাপ করে ভেসে ওঠে নানা রকম মাছ। পুকুরের ওপারে ’ছয়বেহারা’ পালকি চালকের বসবাস। তখনকার দিনে গ্রামে পালকি চড়ে দুলকি চালে মানুষ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাতায়াত করতো। বিশেষ করে মেয়েরা। তাদের জন্যে কাঠের তৈরি পালকি অথবা বাঁশের তৈরি ডুলিই একমাত্র যাতায়াত বাহন ছিল। চারজন অথবা দুইজন বেহারা কাঁধে করে যাত্রীসহ পালকি অথবা ডুলি বহন করতো। আজকের দিনে হয়তো সে সম্পর্কে কোন ধারণাই নেই।

গত শতাব্দীর গোড়ার দিকে আমার মাতামহ উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। তার শিক্ষা গ্রহনের অনেক মজার গল্প আমরা বড় হয়ে শুনেছি। ব্রিটিশের রাজত্বের মধ্যগগণে তখন ভারতবর্ষ। ব্রিটিশ হেড মাস্টার। বাঙালি হিন্দু শিক্ষক। বিদ্বান, জ্ঞানী। মানুষ গড়ার কারিগর। ছাত্রকে মানুষ করার জন্য তারা জ্ঞান ভান্ডার উজাড় করে দিতেন। মুসলমান ছাত্র তিনি একা। তার প্রতি অন্য ছাত্রদের প্রচন্ড কৌতুহল। মুসলমান ছেলে লেখাপড়া শিখতে এসেছে। মদ্রাসায় নয় – ইংরেজী স্কুলে। যেন অবিশ্বাস্য ঘটনা! ক্লাসে একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারলে অট্টহাসি চেপে রাখার হর্ষধ্বনি শ্রবণে লজ্জায় মাথা নত হয়ে যায়। দু’একবার এমন হওয়ার পর নানাজান সতর্ক হন। লেখাপড়ায় খুব মনোসংযোগ করেন। হাইস্কুলের লেখাপড়া, তাও ইংলিশ মিডিয়াম।পড়া তৈরি করে দেয়ার কেউ নেই। তবুও মেধা ও মননশক্তির অনুশীলন করে তিনি ততকালীন শিক্ষা ব্যবস্থায় এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরবর্তীতে ‘গুরু ট্রেনিং’ ও গ্রহন করেন। শিক্ষকতা করার যোগ্যতা অর্জন, অধুনা যাকে টিচার্স ট্রেনিং বলে। তাছাড়া তখনকার রেওয়াজ অনুযায়ী আরবী, ফার্সিতে যথেষ্ট পারদর্শী ছিলেন তিনি। সেই মাতামহ আমার গ্রামেই স্কুলে মাস্টারি করতেন। সৎ জীবন যাপনের জন্য তার দৃষ্টিকোণ থেকে শিক্ষকতাই ছিল মহান পেশা। স্বচ্ছল পরিবারের সন্তান ছিলেন তিনি। অভাব অনটন কাকে বলে জানতেন না। ধর্ম, কর্ম, পরোপকার করেই জীবন কাটিয়েছেন।

এমন এক মহান ব্যক্তির ঘরে আমার মায়ের জন্ম। প্রথম মহাযুদ্ধের ডামাডোল বাজছে তখন পৃথিবী জুড়ে। ঘরে ঘরে মানুষ যে কোন বিপদের আশংকায় শংকিত। তবুও মানুষের জীবনযাত্রা থেমে নেই। কন্যা সন্তান তখনও পিতামাতার কাংখিত সন্তান ছিলনা। কিন্তু দুই পুত্রের পর আমার মা আশীর্বাদের মত তাদের কোলে এলেন। স্বভাবটি ছিল তার ভারি মিষ্টি। অনেকটা তার মায়ের মতো। স্নেহমাখা- হৃদয় কাড়া। হাঁটি হাঁটি পা পা করে অনন্দে ভরে তুললেন ঐ মাটির গৃহাঙ্গন। তার মা গড়িয়ে দিয়েছিলেন রূপার নূপুর! ঘুংগুরের গোটা লাগানো চরণালংকার। তার পায়ের মধুর ছন্দায়িত শব্দই তার মাকে জানিয়ে দেয় সে কোথায় আছে।

মেয়েদের লেখাপড়া শিখার কোন রেওয়াজ ছিল না তখন। বিদ্যার্জনের অধিকার ছিল কেবল ছেলেদের। অনেক বড় বড় বিদ্বান ব্যক্তির স্ত্রী ও কন্যারা অশিক্ষিত ছিলেন। তাতে লজ্জা বা সংকোচের কোন বালাই ছিল না। মেয়েরা মূর্খ থাকবে এটাই স্বাভাবিক। মেয়েরা গৃহকর্মে, সূচিশিল্পে বা সৌন্দর্য্য সৃষ্টির কাজে নিয়োজিত হতো। বড়জোর আরবী পড়া, নামাজ শিক্ষা এবং ফারসি পড়ার অনুমতি দেয়া হতো। তাও অন্তঃপুরে বসে, বাড়ির বাইরে নয়।

শিক্ষক পিতা শিক্ষার মর্ম বুঝতেন। কন্যাকে নিজেই বাংলা ও ইংরেজি শেখালেন। আমার মা কোনদিন বিদ্যালইয়ে পরীক্ষা না দিয়েও যথেষ্ট বিদুষী ছিলেন। পড়াশুনায় ছিলতার গভীর আগ্রহ -আজও আছে। আমার মামারা উচ্চ শিক্ষা গ্রহন করেন। বড় মামা সরকারি চাকরি নিয়ে শহরে বসবাস করেন। ছোট মামা ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য বিলেতে গমন করেন।

সেই সময়ে সরকারি কাজকর্ম করার জন্য যে সমস্ত ব্যক্তি গ্রামে আসতেন তাদের জন্য আমার মাতামহের বাড়িটি ছিল সরাইখানা। আমার নানিজানের হাতের রান্না ছিল বড়ই উপাদেয়। তিনি তার সরকারী চাকুরে পিতার সঙ্গে অবিভক্ত ভারতের লক্ষ্ণৌ, কানপুর, এলাহাবাদ - এ সমস্ত অঞ্চলে কৈশোর কাটিয়েছেন। সেই জন্য তিনি মুঘলদের রন্ধন প্রণালী দক্ষতার সঙ্গে আয়ত্ব করেছিলেন। তার তাহের তৈরি খাবার খেয়ে সকলেই তুষ্ট হতেন এবং ধন্য ধন্য করতেন। সে বাড়ি আদর-যত্ন, খানা পিনার জন্য ছিল খুবই মশহুর। একবার একজন অতিথি বলেই ফেললেন,যে বাড়ির মেয়েরা এত চমতকার রান্না জানেন, সে বাড়ি আসলেই খানদানি বাড়ি। পরবর্তী কালে সেই স্কুল ইন্সপেক্টরের একমাত্র পুত্রের সঙ্গেই আমার মায়ের বিয়ে হয়।

আমার মা ধীর স্থির সুশ্রী এবং অতিশয় দক্ষ একটি মেয়ে। সব সময় মুখে তার মধুর আদুরে হাসি। সকলের জন্য তার মমতার হাত প্রসারিত। খুব সন্তর্পণে প্রবেশ করলেন পরগৃহে। না পরগৃহ নয়, সেটি ছিল তার আপন ঘর। সুখের নীড় রচনার প্রথম সোপান। শ্বশুর-শাশুড়ি বা অন্য কেউ পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়াননি। বরং মাতৃস্নেহে বরণ করেছিলেন তাকে। ‘সুখে থাকী, সুখী হও’ – এই আশীর্বাদ করেছিলেন সকলে।

একটি শান্তির শ্রী সর্বদা আমার মাকে ঘিরে থাকতো।তাই দিয়ে তিনি সকলের মন জয় করেছিলেন। কিছুকালের মধ্যে পারিবারিক সকল দায় দায়িত্ব এসে পড়লো তার কাঁধে। মা সানন্দচিত্তে সব ভার গ্রহণ করলেন। আনন্দ ধারা বয়ে চললো দুই পরিবারে। আল্লাহ মেহেরবান। তাই সৎ শিক্ষক পিতার ঘরে আনন্দের বন্যা। আকুল পরিদর্শক পিতামহ আমার নিষ্ঠাবান ধার্মিক ছিলেন। তাই সৌভাগ্যের কাছে তার কিছু পাওনা ছিল। সেজন্য তিনি যোগ্য পুত্রের জন্য যোগ্যতর পুত্রবধূর সন্ধান পেয়েছিলেন।

সেই সময়ে, ব্রিটিশ আমলে, খুব অল্পসংখ্যক বাঙালী সরকারি উচ্চপদে আসীন ছিলেন। তারমধ্যে মুসলমানের সংখ্যা ছিল একেবারে নগণ্য। ইংরেজি শিক্ষায় ছিল মুসলমানদের ঘোরতর অনীহা। আমার পিতা ছিলেন মেধাবী ও তুখোড় ছাত্র। কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে এমএ পাশ করেছিলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। মনোনীত হয়েছিলেন ইংরেজ শাসিত ভারত সরকারের বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসের জন্য। ভারতের সিভিল সার্ভিস একাডেমি থেকে ট্রেনিং সমাপ্ত করে পাবনায় পোস্টিং নিয়ে আসেন। ইস্ট বেঙ্গলে চাকরী করার অভিলাষ ব্যক্ত করে তিনি আরজি পেশ করেছিলেন উর্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে। প্রার্থনা মঞ্জুর হয়েছিল। তখন মা আমার নানার বাড়িতে অবস্থান করছিলেন। শুভ পরিণয়ের অল্পকাল পরেই বাবা দেরাদুনে চলে যান। তাঁর ফিরে আসায় মায়ের বিরহের অবসান ঘটে। তিনি মাকে নিয়ে চলে যান পাবনা। সেখানে সরকারি বাসভবন তাদের জন্য নির্দিষ্ট করা ছিল। ওখানে সদর মহুকুমায় এসডিওর পদে নিযুক্তি পেয়েছিলেন তিনি। মা মনের মাধুরী মিশিয়ে গড়ে তুললেন তাঁর সোনার সংসার। ঘরই যার স্বর্গ-মর্ত্য , ঘর যার সমগ্র বিশ্ব, তার ঘরখানাই তো হতে হবে সুন্দর। তাই তিনি সৃষ্টি করলেন আপন ভুবন। মনের মতো স্বামী পেলে কোন মেয়ে না ঘর সাজায়!

আমার বাবা ছিলেন প্রানোচ্ছল আমুদে প্রকৃতির। অফিসের দায়িত্ব পালন শেষে বাড়ি ফিরে মাকে নিয়ে বের হতেন বেড়াতে। দেখতে যেতেন নানা দর্শনীয় স্থান। মাঝে মাঝে ছুটির দিনে দীর্ঘ ভ্রমণে বের হতেন। উত্তর বঙ্গে যত দর্শনীয় – রমণীয় স্থান ছিল সব দেখা শেষ হলো। তখনকার দিনে যাতায়াত ব্যবস্থা এত উন্নত ছিলনা। রাস্তা ঘাটের অবস্থা খুব খারাপ ছিল। মানুষ ঘোড়ায় চড়ে, গরুর গাড়ি চড়ে গ্রামাঞ্চলে দুর্গম পথে যাওয়া আসা করতো। বগুড়ার মহাস্থানের পুরাকীর্তি, বৌদ্ধদের প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন পাহাড়পুর। হিমালয়ের দক্ষিণে এতবড় বিদ্যাপীঠ তখনকার যুগে আর ছিল না। নাটোর দিনাজপুরের শেষ প্রান্ত তেঁতুলিয়া পর্যন্ত সকল দর্শনীয় স্থান তাঁরা দেখে ফেললেন। জলপাইগুড়ি শিলিগুড়িও বাদ গেল না।

সিভিল সার্ভিসের অফিসারদের ক্লাবে, পার্টিতে, বন্ধু-বান্ধবদের নিমন্ত্রণে- সকল প্রকার উতসবে মা ছিলেন বাবার সহচরী। সাজগোজ করলে মাকে নাকি রাজকুমারীর মতো দেখাত। রক্ষণশীল পরিবারের মেয়ে । শালীনতা রক্ষা করে মা সাজগোজ করতেন।বাবা ছিলেন হাসিখুশী প্রাণবন্ত।মা স্বল্পভাষী, বুদ্ধিদীপ্ত। তাঁদের বন্ধু বান্ধবের সংখ্যা ছিল প্রচুর। তাঁদের গৃহ

ছিল আনন্দপুরী। তাঁদের প্রতিদিন খুশীর দিন। মানুষ ছিলেন মাত্র দু'জনা। আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধবে বাড়িটি থাকতো কোলাহল মুখর। উতসব অনুষ্ঠান বাসায় লেগেই থাকতো। তারা এত সুখে ছিলেন যে, সুখের পায়রাটিকে স্বর্গ থেকে ছিনিয়ে এনে তাদের মর্ত্যের গৃহকোণে স্থাপন করেছিলেন।
'সময় বয়ে যায় নদীর স্রোতের প্রায়।' তিরিশের দশকের প্রারম্ভেই আমার ভাইয়ের জন্ম হয়। তখনকার দিনে পুত্র সন্তান। তাও আবার প্রথম সন্তান। চাঁদের মুখখানি তার। আশীর্বাদ কেড়ে নিল সকলের। দাদা–নানার পরিবার হলো ধন্য তাদের তৃতীয় পুরুষের আবির্ভাবে। তারা সোনার মোহর ভরে দিলেন ছোট শিশুর ছোট হাতের মুঠোতে।

দিন যায় শিশু বড় হতে থাকে।মুখে তার আধো আধো বোল। পায়ে এলোমেলো পদক্ষেপ। হোঁচট খেয়ে পড়ে যায় বারবার। প্রথম কবিতা শিখল, 'হাঁটিতে শিখে না কেহ না খেয়ে আছাড়।' তার মুখে সে সময় অস্পষ্ট উচ্চারণে ঐ শব্দ কয়টি বড়ই শ্রুতিমধুর ছিল।যতবার পড়ে যেত ততবারই সে কবিতার পঙক্তিটি আওড়াতো। যারা তার কচি মুখের আধো আধো বোল শুনেছিল, তারা প্রত্যেকে তা আনন্দের সাথে স্মরণ করে।

ছয় বছর বয়সে আমার ভাইয়ের হাতেখড়ি হয়, অর্থাৎ স্কুলে নাম লেখানো হয়। তখন আমার বয়স মাত্র দু'বছর। মাতৃক্রোড়ে পরম যত্নে, পরম আহ্লাদে বেড়ে উঠতে থাকলাম। কেটে গেল আরো দু'বছর। এর মধ্যে উত্তরবংগে আমার পিতা অন্য জায়গায় বদলি হলেন। চাকরিতে তার সিনিয়রিটি বৃদ্ধি পেল। তিনি এবার পোস্টিং পেলেন ঢাকায়। তখনকার দিনে কলকাতা ছিল বাঙ্গালিদের সবচেয়ে বড় শহর। লোকে কলকাতায় থাকতে পারলে মহাখুশি হয়। কিন্তু ঢাকা আমাদের বাড়ির কাছেই। ময়মনসিংহ আমাদের আদি নিবাস। আমার পিতা তার বাবার একমাত্র সন্তান ছিলেন বলে ঢাকাতে আসতে পারলেই খুশি। এখান থেকে বাড়ির সংগে যোগাযোগ তথা যাতায়াত কম সময়ে করা সম্ভব। বৃদ্ধ পিতা মাতার খোঁজ খবর রাখা তার একান্ত কর্তব্য।

ঢাকায় এসেই আমার মা গ্রামে সকলের সঙ্গে দেখা সাক্ষাত করতে গেলেন। প্রথমে আমার দাদার বাড়ি–পরে নানার বাড়ি। বাবা এদিকে সরকারি বাংলো পেলেন। মা আমাদের নিয়ে বাসায় এলেন। ছেলেকে স্কুলে দিলেন। তারপর মনপ্রাণ ঢেলে দিলেন গৃহস্থালী সাজাবার কাজে। তার যা স্বভাব।

পুলিশের একটি ট্রেনিং সেন্টার ছিল ঢাকায়। একদিন আমার বাবা ইমতিয়াজ খান কোন এক সরকারি কাজে ঐ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে যান। সেখানে কাজ শেষ করতে তার বেশ সময় লেগে যায়। তিনি অফিস থেকে বেরিয়ে দ্রুত কয়েকটি করিডোর অতিক্রম করে পোর্টিকোতে অপেক্ষমান তার জীপের সামনে এসে দাঁড়ান। চালক জীপের দরজা খুলে দেয়। তিনি জীপে ওঠার উদ্যোগ নেন। ঠিক সে সময়ে অতর্কিতে তিনি মাথায় গুলিবিদ্ধ হন। ততক্ষণাত তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন এবং তখনই মৃত্যুবরণ করেন। ড্রাইভার কিছু না বুঝেই চিতকার শুরু করে। অনেকেই ছুটে আসেন ঘটনাস্থলে। ঘটনার আকস্মিকতায় সকলেই হতবাক-সকলেই কিংকর্তব্যবিমূঢ়! কি করে সম্ভব হলো এমন মর্মান্তিক ঘটনা? কেন এমন ঘটলো এ প্রশ্ন সবার মুখে। কেউ কিছু বুঝে উঠতে পারল না।
পুলিশ ট্রেনিং সেন্টারে সর্বপ্রকার কর্তব্য পালনে দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রশিক্ষণ দেয়া হত। পুলিশের দায়িত্ব ও কর্তব্যের অন্ত নেই। সর্বপ্রকার পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য তাকে প্রস্তুত থাকতে হয়। সর্বোপরি আত্মরক্ষার কৌশলও তাদের জানা থাকা বিশেষ প্রয়োজন। দুর্বৃত্তের দমন পুলিশের প্রধান কাজ। সেজন্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে সাধারণ আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করার পদ্ধতি শেখানো হতো। সেদিন সেই একাডেমিতে সে সময় রাইফেল চালানোর মহড়া চলছিল। একজন প্রশিক্ষণার্থীর রাইফেলটি হাত থেকে ফসকে যায়। সুতরাং বন্দুকের নল লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। তারই অস্থির একটি আঙ্গুলের চাপে উত্তপ্ত সীসাটি নিক্ষিপ্ত হয়ে আমার বাবার মস্তক বিদীর্ণ করে।

যেখানে থেকে গুলিটি আসে সেটা ছিল বিল্ডিং এর পেছন দিকের একটি মাঠ। বেশ দূরে। বাগানের বৃক্ষলতা, একাধিক বারান্দার রেলিং পেরিয়ে, সামনের বাগানের ঝোপঝাড় ভেদ করে, গুলিটি তার গন্তব্যস্থল খুঁজে পায়। আমার পিতার যমদুত হয়ে নিমেষেই তার প্রাণ হরণ করে নিয়ে যায়। কেউ কল্পনাও করতে পারছে না ঐ এতদূর হতে গুলি এসে শরীর বিদ্ধ হতে পারে। কেউ যদি কোন অবজেক্ট বা বস্ত এভাবে রেখে তাকে নিশানা করে গুলি করতে চায়, তবুও তা অসম্ভব বলে সকলের মনে হয়েছে। এক সেকেন্ড আগে অথবা এক সেকেন্ড পরে হলেও এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটতে পারতো না। নিয়তির নিষ্ঠুর খেলা । ফেরায় কার সাধ্য! আমার পিতা চলে গেলেন। তিনি জানতেও পারলেন না তিনি মারা গেছেন।

আমার মায়ের কাছে সংবাদটি পৌঁছে দেয়ার জন্য বাড়িতে এলেন ট্রেনিং একাডেমির উর্ধ্বতন ব্রিটিশ কর্মকর্তা ও আরো কয়েকজন। মা তাদেরকে দেখে খুশি হলেন। তিনি বললেন, 'আপনারা বসুন। উনি এখনি এসে পড়বেন। আজ উনার একটু আসতে দেরিই হচ্ছে।' তারা কেউ কোন কথা বললেন না। গম্ভীর এক পরিবেশ। আমার তীক্ষ্ণধী মা কিছু একটা আঁচ করে বললেন, 'আপনারা মনে হয় কোন সমস্যায় পড়েছেন। একটু অপেক্ষা করুন। আমি এখনই লোক পাঠিয়ে উনাকে খবর দিই।' উত্তরে তারা জানতে চাইলেন বাড়িতে আর কে কে আছেন? আমার মা সে সময়ে একাই ছিলেন বাসায়। আর আমরা দুজন অবোধ শিশু। এমন সময় পাশের বাংলো থেকে ছুটে এলেন দুই মহিলা। তারা ও অন্যরা এ দুঃসংবাদ ইতিমধ্যে পেয়ে গিয়েছিলেন। তারা আসতে সেই ভদ্রলোকের জন্য একটু সুবিধা হলো। তারা আমার মাকে ধৈর্য্য ধারণ করার উপদেশ দিলেন। ইশ্বরের অমোঘ বিধানের ওপর কারো হাত নেই- একথা বললেন। অতঃপর এই মর্মান্তিক সংবাদটি তারা তাকে দিলেন। মা জান্নাতুল ফেরদৌস যেন অকস্মাত বধির হলেন। কিছুই শুনতে পেলেন না। তিনি আবার জানতে চাইলেন তারা কি বলতে চান। কে মারা গেছে? কে কাকে গুলি করেছে। কোথায় সেই ব্যক্তি?

উত্তরদাতাদের কন্ঠ বাষ্পরুদ্ধ। একটুক্ষণ বিরতির পর তারা পুনরায় উচ্চারণ করলেন সেই মর্মভেদী দুঃসংবাদ। আমার মা বিস্ময়ে বিমূঢ়। অবিশ্বাসের দৃষ্টি নিক্ষেপ করে স্তব্ধ হলেন। যেন কিছুই তার শ্রুতিগোচর হয়নি।

মায়ের বর্ম ছিলেন আমার বাবা। কোন বিপদে আপদে তিনি মাকে নিরাপদ রাখতেন। এখন তার পাশে কেউ নেই। মা আবারও জানতে চাইলেন, এ ঘটনা সত্য কিনা। এবার কেউ উত্তর দিলেন না। তিনি জানতে চাইলেন, 'তিনি এখন কোথায়? কোন হাসপাতালে কি অবস্থায় আছেন?' এ প্রশ্নেরও কোন উত্তর মেলেনি। হঠাত আমার মা চৈতন্য লুপ্ত হলেন। তিনি পাশের ভদ্রমহিলার কোলে ঢলে পড়লেন। খবর শুনে অনেকেই ছুটে এলেন। খবর পাঠানো হলো গ্রামে দুই বাড়িতে। বাসা লোকে লোকারণ্য। এমন সময় আমার বাবা এলেন। ঘরে নয় – প্রশস্ত বারান্দায়। দুগ্ধ ফেননিভ নিজের শয্যায়-মাটির বিছানায়।

মা জানতেও পারলেন না যার জন্য তিনি সারা বিকেল অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন, তিনি এসেছেন নীরবে, নিঃশব্দে। অন্যদিন বাড়িতে পদার্পণ করেই যিনি সহাস্যচিত্তে দুই শিশু সন্তানকে বুকে তুলে নিয়ে তার গৃহে প্রবেশ করতেন, এই ছিল তার নিত্যদিনের রুটিন, আজ তার ব্যতিক্রম হলো। এমন অপ্রত্যাশিত ঘটনায় বাচ্চারাও হতবাক। তারা বুঝতে পারছে না কি ঘটেছে। তবে একটা কিছু যে খুবই খারাপ ঘটেছে, তা তারা অনুমান করতে পেরেছে।

অবশেষে আমার মায়ের জ্ঞান ফেরে। তিনি এত লোকজন দেখে ভীত হন। অল্প সময়ের মধ্যে বুঝতে পারলেন সব কিছু। তিনি উঠে দাঁড়ান এবং ঘরের বাইরে এসেই সেই ভয়ংকর দৃশ্য দেখতে পান। তিনি বাবার লাশের পাশেই বসে পড়েন। তাকে ব্যাকুল আবেগে জেগে উঠার জন্য ডাকতে থাকেন। তার ধারণা, একটা গুলির আঘাতে হয়তো তিনি চেতনা হারিয়েছেন। হয়তো প্রয়োজনীয় শুশ্রূষায় তিনি আবার উঠে বসবেন। আমার মা আমার বাবার ঘুম ভাঙাতে ব্যর্থ হন। তিনি ভবালেন এটা তার অক্ষমতা। তিনি নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগলেন।

আমার বাবা নিশ্চিন্তে ঘুমাতেন। জানতেন যে, সময় মতো মা তাকে জাগিয়ে দেবেন। দিতেনও প্রতিদিন। আজ তার ব্যত্যয় ঘটলো। যে প্রদীপ নতুন সলতা তৈলযোগে কেবলই আলো দিতে শুরু করল, সে কেন এখনই নির্বাপিত হবে? কোন নিষ্ঠুর দানবের ক্রুদ্ধ ফুতকারে এক নিমেষেই নিভে যাবে তার উজ্জ্বল শিখা?

এ প্রশ্নের জবাব কারও জানা নেই। মানুষ ক্ষুদ্র জীব। জীবন মৃত্যুর রহস্য তার বোধগম্য নয়। তার কেন জন্ম হয়েছে সে জানে না। তার জীবন কি ভাবে কোন পথে প্রবাহিত হবে তা সে জানে না। তার কোথায় কিভাবে জীবনাবসান হবে, অস্তিত্ব লয় পাবে, তাও জানে না। এক অমোঘ রশি ধরে মানুষ সমুখ পানে এগিয়ে চলে। চলাই তার ধর্ম, চলাই তার কর্ম। নিয়তি তাকে কোথায় নিয়ে যাবে কেউ তা জানে না। মানুষ কত কি আবিষ্কার করছে, কত অজানাকে জানতে পারছে, কিন্তু জানতে পারছে না তার ভাগ্যের কথা, তার ভবিষ্যতের কথা। তার পরিণতির কথা।

আমাদের মায়ের সুখের সংসার এক উন্মত্ত দৈত্যের মুগুরের আঘাতে চুরমার হয়ে গেল। আমরা চিরকালের জন্য অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত হলাম। আমার বাবা সংসারের সবটুকু আলো , সবটুকু আনন্দ সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন। আমাদের বাড়ি শূন্য, আমাদের ঘর শূন্য। এত আত্মীয়স্বজন শুভার্থীর মাঝে আমরা যেন এক নির্জন দ্বীপের বাসিন্দা। আমার তো বোঝার বয়স ছিল না। তবুও মনে হট তিনি আবার আসবেন; রোজ বিকেলে যেমন আসতেন। আমার ভাই বুঝেও বিশ্বাস করতে চাইতেন না। তিনি ভাবতেন একদিন না একদিন তিনি আসবেন। না এসে কি পারেন? কত দিন তিনি আমাদের ছেড়ে থাকবেন? কিন্তু তিনি কোনদিন আর একটিবারের জন্যও এলেন না!
বিজন বনে গেলেন চলে আলোর দীপটি নিয়ে।
আমরা যে তার ফেরার আশায় রইলেম পথ চেয়ে।
তারপর আমার ভাই সেই ছোটবেলা থেকেই মুখখানি ভার করে রাখতেন। এখনো তার স্বভাবটি গাম্ভীর্যপূর্ণ। বাবার মতো আমুদে নয়।

।। দুই।।

বাবার তীরোধানে আমাদের শহর ছেড়ে গ্রামে যেতে হচ্ছে। তাছাড়া সরকারি বাংলো আর কতদিন আমরা ধরে রাখবো? আমাদের ঢাকা ত্যাগের পূর্ব মুহূর্তে এক তরুণ ভদ্রলোক আমাদের বাসায় এসে হাজির। অত্যন্ত বিষন্ন, বিমর্ষ তার চেহারা। মায়ের সাক্ষাত প্রার্থনা করলেন। মা তখন অনেকটা অন্য জগতের বাসিন্দা। নিজের দিকে , সংসারের দিকে মাঝে মধ্যে নজর দিতেন। নানি, দাদিরাই সংসার দেখতেন। তবুও মা এলেন তার সামনে। মাকে দেখে তার কন্ঠ বাস্পরুদ্ধ হলো। কি কারণে তিনি এসেছেন, কি বলতে চান, মা স্পষ্ট করে জানতে চাইলেন। তরুণ ভদ্রলোক অতিশয় বিনয় সহকারে এ বক্তব্য পেশ কররলেন তার মর্মার্থ হলোএই যে, সেদিন বাবার মৃত্যুর জন্য তিনি দায়ী। তার অনভ্যস্ত হাত হতে হঠাত রাইফেলটি পড়ে যাওয়ার জন্যই সেই দুর্ঘটনা ঘটেছে।
‘আমার জন্যই আপনাদের পরিবারের এতবড় সর্বনাশ হয়েছে। আমাকে আপনারা শাস্তি দিন। যা শাস্তি দিবেন মাথা পেতে নেব। অনুশোচনার গ্লানিতে আমার হৃদয় মন আত্মা এক মুহূর্তের জন্যও স্বস্তি পাচ্ছে না। আমি কেন ঘাতক হলাম? আমার হাতে কেন এক নিরাপরাধ মানুষের মৃত্যু হলো?’
তরুণ ভদ্রলোক কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। বললেন, ‘আমার স্বাভাবিক আহার নেই, নিদ্রা নেই। অপরাধবোধ আমার আত্মাকে কুরে কুরে খাচ্ছে। আইনের চোখে আমার শাস্তি নেই। কারণ ঘটনা অতর্কিতে ঘটেছে। ইচ্ছে করে ঘটাইনি। তাই আমাকে শক্ত ওয়ার্নিং দিয়ে ছেড়ে দিয়েছে। মিন্তু আমি এ জীবন দিয়ে কি করবো? আমায় আপনি শাস্তি দিন। কঠিনতম শাস্তি। যাতে মুক্তি পাই, শান্তি পাই।’
আমার মা ও অন্যরা কোন মন্তব্য করেননি। তাদের বলার কিছুই ছিল না। আমার মামা তরুণ ভদ্রলোককে ভাল ভাল কথা বলে বিদায় করলেন। ঘরের দিকে মুখ ফিরিয়ে মামা বারান্দায় উঠে এলেন। দীর্ঘ টানা বারান্দার একেবারে শেষ প্রান্তে একটি লেখা তার চোখে পড়লো। আগে যারা ছিলেন তাদের কেউ একজন ওই লেখাটি বেশ বড় হরফে লিখে দেয়ালে টাঙ্গিয়ে রেখেছিলেন। কেন যে নিয়ে যাননি সংগে করে, তা তারাই জানেন। লেখাটি কার হৃদয় নিঃসৃত বাণী তাও জানা যায়নি। ওখানে লেখা ছিলঃ

‘চিরকাল একি লীলা গো অনন্ত কল্লোল
ডান হাত হতে বাম হাতে লও
বাম হাত হতে ডানে
নিজ ধন তুমি নিজেই হরিয়া
কি যে কর কে বা জানে।।’

লেখাটি বারবার পড়লেন মামা। মনটা বিষাদে ছেয়ে গেল। কেন এমন হয় পৃথিবীতে? মানুষের জীবন কতটুকু? তার মধ্যে অকালে ঝরে যাওয়া। তাও অপঘাতে? এই কষ্টের বোঝা এই পরিবার কিভাবে বইবে – কিভাবে সইবে? এই সীমাহীন বেদনার ভার কিভাবে লাঘব করা যাবে – কে জানে!
বেশী সুখ মানুষের কপালে সয় না। আমার মা তার পুড়ে যাওয়া সংসার গুটিয়ে গ্রামে তার পিত্রালয়ে ফিরে গেলেন। সবুজ বনানী ঘেরা গ্রামের সুশীতল ছায়াতলে বৃদ্ধ পিতামাতার স্নেহের আড়ালে তিনি স্বান্তনা খুঁজে পাবার প্রয়াস পান। আমাদের লালন পালনের ভার নানা নানিই গ্রহণ করেন।

আমার ভাইকে কিছুদিনের মধ্যে শহরে মামার বাসায় রেখে হাইস্কুলে ভর্তি করা হলো। পর্যায়ক্রমে আমিও আরো কয়েকবছর পর মক্তবের পাঠ শেষ করে শহরে চলে এলাম। শহরের লেখাপড়া গ্রামের চাইতে যথেষ্ট কঠিন। তবে কয়েক মাসের মধ্যেই আমাদের লেখাপড়া আর কঠিন মনে হলো না। কয়েক ক্লাস ওপরে এসে আমরা প্রথম সারিতে চলে এলাম। আমার মা এতদিনে সম্বিত ফিরে পেলেন। তিনি আমাদের দিকে ফিরে তাকালেন। আমাদের নিয়ে আবার স্বপ্ন দেখতে শুরু করলেন। আবার আশায় বুক বাঁধলেন।
যথাসময়ে আমি ময়মনসিংহের বিদ্যাময়ী স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাশ করায় ঢাকায় ইডেন কলেজে ভর্তি হলাম। এবার আমিও মামার বাসায়। মামী কিছুতেই হস্টেলে থাকতে দেবেন না। আমার ভাই মামার বাসায় থাকার দরুণ নানাজানের আর্থিক চাপ একটু কম হতো। এবার আমিও মামার বাসায় এসে হাজির। আমার ভাই ছাত্র ভাল ছিলেন। তাই রেজাল্টও ভাল হয়েছে। সেজন্য ইতিহাস বিভাগেই শিক্ষক নিয়োগ পেলেন। নানাজানের দায়িত্ব একটু কমলো। আমার ভাই আমার পড়াশুনার খরচের ভার নিলেন। আমার ভাইয়ের নাম ইসতিয়াক খান। বাবা তার নিজের নামের সাথে মিলিয়ে পুত্রের নামকরণ করেছিলেন।

আমরা দুই ভাই বোন এখন মামার বাসায়। মামার দুই ছেলে এক মেয়ে।আমরা সকলেই আপন ভাই বোনের মত। তখনকার দিনের মানুষরা আত্নীয় স্বজনদের প্রতিপালন করতেন। বিশেষ করে যারা শহরে বসবাস করতেন। গ্রামের আত্নীয়দের, এমনকি অনাত্নীয়দের ছেলেদেরকেও বাসায় রাখতেন। তাদের পড়াশুনা চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ দিতেন। আজকে সে রকমটি কল্পনা করাই যায় না। গ্রামের একটি ছেলেকে বাসায় থাকতে দেয়ার কথা ভাবলে অনেকের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়বে।
হতাশা আমার ভাল লাগে না। দুঃখ দুঃখ ভাব নিয়ে থাকা আমার একদম পছন্দ নয়। কারণ জ্ঞান হওয়ার পর থেকে বিষণ্নতাই আমাদের নিত্যসঙ্গী। সেইজন্য মনে মনে পণ করেছিলাম আনন্দে থাকবো। হাশিখুশী থাকব। আমি যেখানে থাকতাম আনন্দ থাকতো আমার সংগে সংগে। মামার বাড়িতে তাই আমিই ছিলাম সকলের ভাল লাগার উতস। সব কাজেও ছিলাম পটু। বাসায় যার যা দরকার – আমি সাহায্যের হাত বাড়াতাম। সেজন্য হয়তো বা মামী আমার ওপর খুব খুশী ছিলেন। নির্ভর করতেন তিনি আমার কাজের ওপর, কথার ওপর। তিনি একটু আরামপ্রিয় ছিলেন।একটু সাজগোজ পছন্দ করতেন। আমি তাকে সেসব সুযোগ করে দিতাম। বাড়ির প্রতিটি সদস্য আমার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে-বিশেষ করে মামীর ছেলেমেয়েরা। তারা আমার কথা খুব গুরুত্ব দেয় এবং আমারই আদর্শে অনুপ্রাণিত। বয়সে আমার অনেক ছোট হলেও তারাও বেশ সুন্দরভাবে বড় হতে লাগলো।
আমি এখন উচ্চশিক্ষা গ্রহণে ব্রতী। ইতিমধ্যে পদ্মা, মেঘনা, যমুনা দিয়ে অনেক জল প্রবাহিত হয়েছে। অনেক ঋতু দীর্ঘ সময় ধরে আবর্তিত হয়েছে। অনেক শীত , অনেক গ্রীষ্ম, অনেক বর্ষা আমাদের আমাদের জীবনের ওপর দিয়ে বয়ে গেছে। এক নিদারুণ সত্যকে বহন করে এগিয়ে যাচ্ছি আমরা। আমি কিন্তু হেরে যাওয়ার পাত্রী নই। সব কাজে আমার উতসাহ। মাকে সুখী করতে হবে। আমাদের সুখ দেখে মা শান্তি পাবেন।

আমার লেখাপড়ার শেষ অধ্যায়। ময়মনসিংহের মেয়েদের ট্রেনিং কলেজে ভর্তি হলাম বি. টি. পড়ার জন্য; তাও শেষ হলো একদিন। এবার চাকরির জন্য দরখাস্ত করে চাকরি পেলাম। পোস্টিং হলো বিদ্যাময়ী স্কুলে। খুশীতে প্রাণ চঞ্চল হয়ে উঠলো। কারণ এই স্কুল আমার প্রাণের মতো প্রিয়। আমি এই স্কুলেরই ছাত্রী। ছাত্রী ছিলাম আগে- এখন টিচার হিসাবে কেমন লাগবে, তাই ভাবছি। মামার বাড়ি ছেড়ে এবার স্কুলেরই হস্টেলে টিচারদের জন্য নির্দিষ্ট কক্ষে থাকার জায়গা পেলাম। আমার মাতামহ এতদিনে বার্ধক্যের ভারে নুয়ে পড়েছেন। বিশেষ কোন অসুখ বিসুখ ছিল না তাদের। তবু শরীরের কাঠামো জীর্ণ –শীর্ণ হলো। আমরা দুই ভাই বোন তাদের সামনেই প্রতিষ্ঠিত হলাম। আমার দাদা-দাদীও খুব আনন্দিত হলেন। তাদের জীবন প্রদীপ নিবু নিবু। হয়তো আমাদের দুই ভাই বোনের সাফল্য দেখার জন্য বেঁচে ছিলেন।চাকরিতে যোগদান করে দেখতে গেলাম তাদেরকে গ্রামে। প্রাণ ভরে আশীর্বাদ করলেন। অতীতের কথা স্মরণ করে চোখের পানিতে বুক ভাসালেন। সেটি ছিল তাদের সংগে আমার শেষ দেখা।

প্রথম কর্ম জীবন আমার। বুঝে নিতে দেরী হলো না। একটা কথা প্রচলিত ছিল তখন। শিক্ষকতাই মেয়েদের জন্য উত্তম পেশা । সবচাইতে মর্যাদাসম্পন্ন, সম্মানের। ততদিনে শিক্ষকতায় মেয়েদের সংখ্যা বেশ বৃদ্ধি পেয়েছে। সকলের সহযোগীতা পেলাম। কাজও ভাল লাগলো।
এমন সময় একদিন সংবাদ এলো আমার দাদা এন্তেকাল করেছেন। শিক্ষিত, সৎ প্রতিষ্ঠিত এবং সকলের ভালবাসা পাওয়া একজন ব্যক্তিত্ব পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন। একসময় তার জয়জয়কার ছিল। ইংরেজ আমলে পশ্চাদপদ মুসলমান সমাজে তার মত সুশিক্ষিত , চিন্তাশীল লোকের সংখ্যা খুব বেশী ছিল না। এর কয়েক মাস পরে আমার দাদীও পরকালের ডাক শুনতে পেলেন। তিনি পরম শান্তিতে ইহধাম ত্যাগ করলেন। একটি প্রজন্ম শেষ হয়ে গেল।

আমার চাকরী পাওয়ার পর আমার নানা-নানীও হঠাত অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তাদের সব দায়িত্ব যেন শেষ। এবার তাদের ছুটি। হয়তোবা আমাদের দুই ভাইবোনের মানুষ হওয়া পর্যন্ত তারা তাদের সর্বশক্তি দিয়ে নিজেদের চালু রেখেছিলেন। এতদিনের পথচলা শেষ। জীবনের শেষ স্টেশনে এসে বসে আছেন। গাড়ির অপেক্ষায়। যার যার গাড়ি এলেই উঠে চলে যাবেন।
আমার মায়ের অনুরোধে একবার আমরা সকলেই মামাদেরসহ বাড়ি গেলাম। খুব হৈচৈ। কারো কোন কাজ নেই। অফিস নেই, স্কুল নেই, কলেজ নেই। শুধু গল্প, ভাল ভাল খাওয়া আর আনন্দ করা। বৃদ্ধ নানা-নানী, মধ্যবয়সী মা, মামা, মামী, আমরা তরুণ কিশোর ভাই বোনেরা – সব একবয়েসী হয়ে গেলাম। মনে হলো, আমরা কেউ বড় নই, কেউ ছোট নই। সব সমান। এবারকার মতো আনন্দ আমরা জীবনে কোনদিন পাইনি। আমার মা, মামা-মামীদের ছেলেমানুষী দেখে আমরা অবাক হয়ে গেলাম। পরম আনন্দে কেটে গেল বেশকিছু দিন। এবার যার যার কাজে ফিরে যাওয়ার পালা।

সবাই শহরে চলে গেল। বাড়ি ভীষণ ভাবে নির্জন হয়ে গেল। ভাঙ্গলো মিলন মেলা। বাড়িটিকে ঘিরে ধরলো নীরবতা। মা সংসারের হাল ধরেছেন দীর্ঘদিন পর। আমার মাতামহ এবাদত বন্দেগিতে জীবন উতসর্গ করেছিলেন।আমরা বাড়ি হতে চলে আসার পর একদিন নামাযের সিজদায় তার হৃদযন্ত্র বন্ধ হয়ে যায়। তিনি আর উঠতে পারলেন না। তিনি এন্তেকাল করলেন। বয়স হয়েছিল তার যথেষ্ট। কিন্তু পিড়ীত ছিলেন না। খাওয়া দাওয়া, চলা ফেরা সবকিছু তিনি নিয়ম মতো করতেন। সেজন্যই বার্ধক্য ব্যাতীত তার আর কোন ব্যাধি ছিল না। তিনি ভাগ্যবান। কারো অনুগ্রহের পাত্র হতে চাননি। তার আত্মসম্মান জ্ঞান ছিল খুব প্রখর। আকস্মিক মৃত্যুতে তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হলো। মানুষ মরণশীল। গভীর সন্তাপের মাঝেও এভাবে সান্ত্বনা লাভের প্রয়াস পাই।
আমার সহকর্মীরা ভাল। শিক্ষিত পরিবেশ। সহকর্মীদের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে। মাঝে মাঝে যারা শহরে নিজের বাসায় থাকেন, তাদের ওখানে যাই। একদিন বিকেলে মনোয়ারা নামের এক শিক্ষিকার বাসায় বেড়াতে যাই। রাজশাহী থেকে এক ভদ্রলোক ময়মনসিংহ এসেছেন। তার সেখানে সরকারি কাজ ছিল। এই ছেলেটির নাম শিহাব আহমেদ। মনোয়ারার ভাই তার বন্ধু। বিশ্ববিদ্যালয়ে সতীর্থ ছিল। সেই পরিচয়ে শিহাব ওদের বাসায় উঠেছেন। বিকেলে চায়ের টেবিলে তার সঙ্গে পরিচয় হয়। স্বল্পভাষী ভদ্রলোক। তবুও অনেক প্রসংগে আলাপ হয়। মনে হলো বুদ্ধিমান। লক্ষ্য করলাম তার চিন্তাধারার সাথে আমার চিন্তার যথেষ্ট মিল রয়েছে।

ময়মনসিংহে কেটে গেল আমার কয়েক মাস। একদিন খবর পেলাম আমার মাতামহী গুরুতর অসুস্থ। মা বাড়িতে একা। আমরা সকলেই গ্রামে চলে গেলাম। ভাগ্য ভাল আমাদের যে, তার সংগে শেষ দেখা হলো। তিনি আমাদের চিনতে পারলেন। কথা বলার শক্তি ফুরিয়ে গিয়েছিল। তাই নীরবে চোখের জল ফেলে আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। নানী পূন্যাত্মা ছিলেন। সারাজীবন তিনি মানুষের সেবা করেছেন। মানুষকে ভালবেসেছেন। তাই হয়তো তার রোগহীন শরীর জীর্ণ শীর্ণ হয়ে প্রাণ ধারণের ক্ষমতা হারায়। যে মাটি হতে তিনি সৃষ্টি হয়েছিলেন, সেই মাটিতেই তিনি ফিরে গেলেন।

এবার আমার মায়ের কথা ভাবতে হবে। নির্জন বাড়িতে তাকে একা রাখা ঠিক হবে না। কারণ মৃত্যু তার জীবনকে বারবার আন্দোলিত করেছে। সেই জন্য মাকে ঢাকায় আমার মামার বাসায় নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নেয়া হলো। মামা মামী একরকম জোর করেই মাকে নিয়ে এলেন। ধর্মীয় করণীয় সব অনুষ্ঠান শেষ করে মা ঢাকায় এলেন।

মামার এক দূর সম্পর্কের চাচাতো ভাইকে নানাজান বাড়িতে রেখেছিলেন। তার নাম নুরু মিয়া। নানাজানের ফাই ফরমাশ খাটতো। সে ছিল নানাজানের ডান হাতের লাঠি। মা তাকে বিয়ে দিলেন। বাড়িঘরের, ক্ষেত খামারের সব দায়িত্ব নুরু মিয়েকে বুঝিয়ে দিলেন। নতুন বউ নিয়ে সে শুরু করল যাত্রা সেই বিরান বাড়িতে।

কোন ব্যক্তি যদি মারা যান তবে তার বিষয় সম্পত্তি, ধন দৌলত তার যথার্থ উত্তরাধিকারের হাতে পড়লো নাকি অন্য লোকের ভোগে লাগলো, তাতে তার কিছুই যায় আসে না। আসে যায় যতদিন তিনি জীবিত থাকেন।
মায়ের হলো গ্রাম থেকে শহরে প্রত্যাবর্তন। জীবন যে কত কক্ষপথে আবর্তিত হয়। দীর্ঘকাল গ্রাম্য পরিবশে বাস করে তিনি প্রকৃতির সংগে মিশে গিয়েছিলেন। বাড়ির দক্ষিণে আম, জাম, বকুল, পিয়ালের বিস্তৃত বাগান। বিশাল বাগানের চারপাশ ঘিরে আছে দীর্ঘ আনারসের সারি। যখন মৌসুম আসে শত শত আনারসের ফুল মাথা উঁচু করে বের হয়, সৃষ্টি হয় অপূর্ব দৃশ্যের। মনে পড়ে সেই কথাটি, 'বাগান থেকে বেরুলো টিয়ে, সোনার টোপর মাথায় দিয়ে।'

বাড়ির উত্তর দিকে বাঁশ বাগান। মলয় হিল্লোলে তার পাতায় বেজে উঠে মর্মর ধ্বনি। এই কম্পনের মৃদু ঝংকারে যে আলাপন সৃষ্টি হয় তার সংগে সেখানকার মানুষের পরিচয় কতই না নিবিড়। ভোর না হতেই চেনা অচেনা পাখির মধুর কূজনে চারিদিক হয় মুখরিত। সে এক অনির্বচনীয় আনন্দ। তারপর সোনার থালার মত সূর্যি মামার উদয়। কোমল আলোর পরশে মানুষ জেগে ওঠে, নিদ্রার মোহমুক্তি ঘটে। শহরে এসে মায়ের এই সময়টুকুর জন্য প্রাণ কেমন করে। খুব তার কষ্ট হয়। কিন্তু উপায় নেই। নিয়তির বিধান। তবে মাঝে মাঝে মা গ্রামে যান। চির পরিচিত গ্রাম, জন্মস্থান। আত্মার সংগে তার বন্ধন। শয়নে স্বপনে ঐ জগতেই থাকেন। শুধু জাগরণে তিনি শহরে-অন্য এক পরিবেশে। এটাই এখন বাস্তব।

।। তিন।।

সবুজ গ্রামখানি। দিগন্ত জোড়া ঢেউ খেলানো শস্যক্ষেত। কিন্তু সমীরণে শ্যামলা মায়ের সোনালী আঁচল খানি দুলে ওঠে। পেছনের ফেলে আসা সেই শান্তির নীড়ের কথা মা ভুলে যেতে পারেন না। তাকে ফিরে ফিরে সেখানে যেতে হয়। সেই বাড়ি, সেই ঘর, সেই আঙ্গিনা, দীর্ঘ পুকুর, বাগান, গাছ গাছালি, ক্ষেত খামার সব আছে। নেই শুধু প্রাণের মত প্রিয় মানুষগুলো । সেই সকাল, দুপুর, সন্ধ্যা। প্রতিদিন ভেসে আসে সুমধুর আজানের ধ্বনি। মানুষ কোথায় যায়? তাদের স্বপ্নে গড়া, পরিশ্রমের ফসল – সব কিছু আছে। অথচ তারাই নেই! আমার নানা নানীর জীবদ্দশায় বাড়ি কেমন গমগম করতো। কত মানুষের পদচারণায় মুখরিত থাকতো এই প্রাংগন। কতজনার সুখে দুঃখে, সমস্যা সমাধানের জন্য আমার নানাজান সারাজীবন ব্যয় করেছেন, আজ তারা কেন নেই? কেমন করে নেই? এই বাড়িতে আজ অন্য বসতি, অন্যরকম কোলাহল!

মামাদের দূর সম্পর্কের চাচাতো ভাই নুরু মিয়াকে গ্রামের বাড়ি ঘর, বিষয় সম্পত্তি সব কিছু দেখাশোনার ভার দেয়া হলো, যেহেতু নুরু মিয়া বাল্যকাল হতেই সেই বাড়িতে অবস্থান করছিল। নানাজানের ফুট ফরমাশ খাটতো। বলতে গেলে সে ছিল নানাজানের বিশ্বস্ত অনুচর-সহচর। সেই জন্য নুরু মিয়ার এত সব বুঝে নিতে কোন অসুবিধে হয়নি।
প্রথম প্রথম আমার মা প্রায়ই গ্রামে যেতেন। কারণ তার সদ্য প্রয়াত মাতা পিতার স্মৃতি তাকে খুব পীড়া দিত। গ্রাম ছেড়ে আসার জন্য গ্লানি বোধ করতেন। তিনি ভাবতেন এটা অন্যায়। বাবা মায়ের অবর্তমানে বাড়ি বিরান করা ঠিক নয়। বংশধর তবে কিসের জন্য? 'বংশে বাতি দেয়া' – একটা কথা প্রচলিত আছে দেশে। সেই জন্মের ভিটায় সন্ধ্যে দেবার কেউ রইলো না। আল্লাহর নাম উচ্চারণ করারও কেউ নাই। নুরু মিয়াই এখন ভরসা। অথচ এসব কর্তব্য পালন করতে হয় বংশধরদেরকেই।

আমার মা ওখানে থাকতে চেয়েছিলেন। ভাগ্য বিড়ম্বিত বিধ্বস্ত আমার মা। তাকে ঐ নিঃসংগ পরিবেশে ফেলে রাখা সমীচীন নয় বলেই একপ্রকার জোর করেই নিয়ে এসেছি মামার বাসায়। মামী অসাধারণ মেয়ে। অসাধারণ বলেই আমরা চিরকাল মামার পক্ষপুটে তার নিজের সন্তানের মত আশ্রয় পেয়েছি। না হলে আমাদের কত যে কষ্ট হত, তা হয়তো কল্পনাও করা যায় না আজ। আমরা পিতৃহীন। পিতৃহীন বলে আমাদের যে কষ্টের সম্মখীন হবার কথা ছিল, সেরকমটি হয়নি কেবল আমার বড়মামার জন্য। তিনি তার পরিবারের সকলকে খুশি রেখে আমাদেরকে তাদের সংগে সম্পৃক্ত করে নিয়েছিলেন। আমার পিতা জীবিত থাকলে তাঁর সঙ্গে যে সম্পর্ক গড়ে উঠতো, আমার সঙ্গে আমাদের সেই সম্পর্কই স্থাপিত হল। আমরা ভুলে গিয়েছিলাম যে আমরা মামাতো ফুফাতো ভাই বোন।

নুরু মিয়ার নিজের জমিজমা ছিল না বললেই চলে। ছিল কেবল বাড়ি ভিটা। ফসলী জমি বিক্রি করে শেষ করে গিয়েছিল তার বাবা। বড় দুই ভাই আসাম গিয়ে বসতি গড়েছিল। আমার নানাজান তাদেরকে সেখানে মাত্র দশ টাকায় এক বিরাট এলাকা ক্রয় করে দিয়েছিলেন। এলাকা বলতে তখন বনজংগলে পূর্ণ অঞ্চল বোঝায়। বাঘ-হরিণ, অন্যান্য বন্য জীব জন্তুর বাসস্থান ছিল সেটা। জংগল পরিষ্কার করিয়ে নানাজান তাদেরকে একটি সুরক্ষিত ছোট বাড়ি তৈরি করে দিয়ে এসেছিলেন। নুরু মিয়ার ভাইরা কঠিন পরিশ্রম করে দিনের পর দিন গাছপালা কেটে সেখানে আবাদী জমি তৈরি করে চাষাবাদ আরম্ভ করে। তাদের ছেলেমেয়েরা ছিল এই অমানুষিক পরিশ্রমের সহযোগী। প্রায় দশ পনের বছর এই জঙ্গল পরিষ্কার করে তারা আসামে অনেক ফসলী জমির মালিক হয়। এত গাছপালা তারা কেটেছিল যে সেগুলো বিনে পয়সায়ও নেবার লোক ছিল না। দীর্ঘদিন ধরে এসব কাঠ ঘড়-বাড়ি তৈরির কাজে ও জ্বালানী হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আসবাব পত্রও তৈরি করে ওরা যথেষ্ট। বন-জংগল সাফ করতে গিয়ে তাদেরকে কত যে হিংস্র জন্তুর মোকাবেলা করতে হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই।

নুরু মিয়ার ভাইরা মাঝে মাঝে নিজ গ্রামে বেড়াতে আসত। তাদের কাছে আসামের নিবিড় অরণ্য আবাদের গল্প শোনা যেত। গ্রামের লোকেরা গোল হয়ে তাদেরকে ঘিরে সন্ধ্যার পর সেই রোমাঞ্চকর কাহিনী শুনত। সে অরণ্য ছিল আদিম অরণ্য। সৃষ্টির শুরু থেকেই সেইসব বৃক্ষের জন্ম। সেসব গাছপালা এতই প্রাচীন যে বয়স নির্ণয় করা সাধ্যের বাইরে। সেই বন ছিল শ্বাপদ সংকুল। হিংস্র বাঘ, ভল্লুক, সিংহ, শৃগাল অন্যদিকে মৃগ, শাখামৃগ, ময়ূর সহ পাখ-পাখালির অন্ত ছিলনা। সেই বনানী কেবলমাত্র বৃক্ষলতা, জীবজন্তুর মেলা ছিল তা নয়, সেখানে ছিল নাম না জানা ফলের গাছ, মন মাতানো বন কুসুম, ঝোপঝাড়, ছন, ঘাস প্রাকৃতিক প্রাচুর্যের সমাহার। শুধু যেন মানুষই বেমানান সেখানে।

গল্প বলতে বলয়ে নুরু মিয়ার কৃষক ভাইয়েরাও কবি দার্শনিকের মত হয়ে যেত। বন জংগলের সাথে সংগ্রাম তাদের। ফসল উতপাদনেও প্রচুর পরিশ্রম। এভাবেই চলতে থাকে তাদের ঘরে বাইরে সংগ্রামী জীবন। নুরু মিয়ার ভাইরা একা নয়। এখানে আরো কয়েক ঘর পরিবার ছিল। তারা লাগালাগি ঘর তৈরি করে বসবাস করত যাতে কোন এক ব্যক্তির বাড়িতে বন্য জন্তু ঢুকে পড়তে না পারে। যখন বাঘ লোকালয় আক্রমণ করত তখন সংঘবদ্ধ ভাবে তারা তা প্রতিহত করত বল্লম এবং বাঁশের তৈরি বর্শা দিয়ে। ভোরে উঠে ওরা অনেক সময় দেখত বিরাট বিষধর সাপ উঠানে কুন্ডলি পাকিয়ে ফণা তুলে বসে বিশ্রাম করছে। একবার নাকি কয়েকজন কাঠুরিয়া বনের ভেতরে একটা বড় কাঠের গুঁড়িতে বসে কল্কিতে ধূমপান করছিল। ধূমপান শেষে কল্কির জ্বলন্ত অংগার সেই কাঠের গুঁড়িতে ঢেলে দেয়। কাঠের গুড়িটা যেন একটু নড়ে উঠে। ভয়ে কাঠুরিয়ার দল তফাতে সরে যায়। দেখে ওটা আরো নড়তে চড়তে শুরু করেছে। প্রকৃতপক্ষে সেটা কাঠ ছিল না। একটি অজগর সাপ লম্বা হয়ে শুয়ে ছিল।

আরেকবার ছেলেরা জংগল থেকে একটি হরিণশাবক ধরে নিয়ে আসে। সাঁঝের আঁধার নেমে আসার পর একটি গুনগুনিয়ে কান্নার করুণ শব্দ শোনা গেল, যেমন নতুন বউ শ্বশুর বাড়িতে গিয়ে কাঁদে। ভুতের কথা স্মরণ করে সকলে ভয়ে শিউরে উঠলো। পরে দেখা গেল হরিণ শিশুটি খুব ছটফট করছে। তখন বাড়ির সকলে বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করল সেই মা হরিণটি নিজের জীবনের বিপদ তুচ্ছ করে বাচ্চার জন্য ছুটে এসেছে শত্রু শিবিরে। ছেলেরা উল্লসিত হয় এমন একটি শিকার হাতের মুঠোয় পেয়ে। হরিণটি আটক করার জন্য ফাঁদ পাতে। কিন্তু তাদের বাবার দয়া হয়। সে ছেলেদের নিরস্ত করে। মৃগ শিশুটিকে মুক্ত করে দেয়। শাবকটি তার মায়ের সংগে নিমেষেই বনপথে অদৃশ্য হয়। এরকম অনেক মজার গল্প নুরু মিয়ের ভাইয়েরা শুনিয়ে যায়।

আসামে গিয়ে তাদের অবস্থা ভাল হয়। স্বচ্ছল জীবনের অধিকারী হয়। পরবর্তীকালে তাদের বংশধরেরা লেখাপড়া শিখে শিক্ষিতের পেশাও গ্রহণ করে। নুরু মিয়ার অন্য ভাইয়েরা দিনমজুরের কাজ করে। তারা অলস। শ্রমবিমুখ। কিন্তু পরিশ্রম না করে যে সুখ পাওয়া যায় না, তারা তা জানে না। নুরু মিয়া শান্তশিষ্ট বলে আমরা তাকে পছন্দ করতাম। সেজন্য নানাজান তাকে বাড়িতে নিয়ে আসেন। সে বিশ্বাসী, পরিশ্রমী। কখনও কোন ক্ষতি করেনি। বরং ক্ষতি রোধ করার চেষ্টা করেছে। কখনো কল্পনা করেনি যে, সে একদিন এই 'রাজবাড়ির' মালিক হবে। সময়ের স্রোত তাকে কোথা হতে কোথায় নিয়ে এলো, আবার কোথায়ই বা নিয়ে যাবে!

।। চার।।

ছোটবেলায় ভূগোলের প্রথম পাঠ ছিল, ‘কয়েকটি ঘর লইয়া একটি বাড়ি হয়। কয়েকটি বাড়ি লইয়া একটি পাড়া হয়। কয়েকটি পাড়া লইয়া একটি গ্রাম হয়।’ বাড়ির সেই সংজ্ঞায় নানাজানের বাড়িতে অনেক ঘর ছিল। একটি বড় আটচালা, দুটি চৌচালা টিনের, ছনের ছাউনিতে রন্ধনশালা, ঢেঁকিশালা, খড়ির ঘর ছিল। মাঝখানে বিরাট উঠোন, নিকোনো বারো মাস, বর্ষাকাল বাদে। বাহির বাটিতে ছিল দুইদিকে বিরাট বারান্দাওয়ালা বৈঠকখানা, দহলিজ, দীঘি, গোয়ালঘর, গরুদের দিনের বেলায় বিশ্রামের জন্য খোলা চালাঘর। যেন এক এলাহী কারখানা। নুরু মিয়ে এখন এই এলাহী কারখানার মালিক।

আমার মাতামহের আটচালা ঘরখানি তালাবদ্ধ থাকে। মামারা বাড়িতে গিয়ে সেই ঘরে থাকতেন। নুরু মিয়া অন্য একটা চৌচালা ঘরে থাকে। প্রথম কয়েক বছর বেশ চলতে থাকলো আগের নিয়মেই। বর্গাদাররা ঠিকমতোই ফসল দিয়ে যেত। গোলা ভরা ধান, গোয়াল ভরা গরু, পুকুর ভরা মাছ, মাঠ ভরা সোনার ফসল। শুধু ঘর ভরা মানুষ নেই।

শহরের জীবন অন্যরকম। চাকুরীজীবী মামা। সময় বের করে গ্রামে যাওয়া ধীরে ধীরে হ্রাস পেল। সুতরাং মায়ের যাওয়া কমে গেল। তিনি তো একা একা গ্রামে যেতে পারেন না। বছরে অন্তত একবার যেতে হয় মামাকে ধান বিক্রি করার জন্য। পরবর্তীকালে বছরে একবার যাওয়াও কঠিন হয়ে পড়ে। ওদিকে নুরু মিয়ার সংসার বড় হতে থাকে। প্রায় প্রতি বছরই তার সংসারে একটি করে নতুন সদস্যের আগমন ঘটে। পাঁচ বছরে সে তিনটি সন্তানের জনক হয়। এই পাঁচবছরে আমার মাতামহের সংসারের নিয়মকানুন সব পালটে যায়। সেই সব সুধীজনরা তাদের নিয়ম, শৃংখলা, আদর্শ সব সংগে করে নিয়ে গিয়েছেন। এখনকার লোকদের এখনকার নিয়ম। নিয়ম না বলে অনিয়ম বললেই ভাল হয়। বর্গাদাররা নুরু মিয়ের শাসন মানতে চায় না। তারা চলে গেছে অন্য লোকের খামারে। পাঁচ বছরেই ‘রাজার বাড়ির’ জৌলুস, অভিজাত চেহারা মলিন হয়ে যায়। চারিদিকে জংগল, জংগলের স্তুপ জমির উর্বরতা হ্রাস, ফসলের ঘাটতি সব যেন ধ্বংসের দিকে। অনেকদিন পর বাড়ি গেলে ক্ষীয়মান চেহারাই চোখে পড়ে। নুরু মিয়া পরিশ্রমী। একা কুলিয়ে উঠতে পারেনা।

নানাজান বিরাট আরাম কেদারায় বসে গড়গড়ার নল মুখে নিয়ে তাম্বাকু দিয়ে তামাক খেতেন। তার হুকুম, তার শাসন, তার সাংসারিক বুদ্ধির সংগে কারো তুলনা চলে না। সুতরাং নুরু মিয়ার প্রাণান্ত। তাকে তো কেউ পাত্তাই দেয়না। বিষয় সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ এত সহজ কাজ নয়। তবুও নুরু মিয়াই সব দেখে।

এদিকে আমরা বড় হয়েছি। লেখাপড়া শিখেছি। চাকরি করছি। জীবনের উত্থান পতন আমাদের শহরে যেমন, গ্রামেও তেমন। তবে ওখানকার ধাঁচটা একটু অন্যরকম। নুরু মিয়ার সংসারের কলেবর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাড়ি ভরা ছেলেমেয়ে। সব ঘর ওরা দখন করেছে। তবুও জায়গা হচ্ছে না।

সেবার আমরা সকলেই গিয়েছিলাম গ্রীষ্মের ছুটিতে। ওদের থাকার অসুবিধা দেখে মা নুরু মিয়াকে নানাজানের আটচালা ঘরে থাকার অনুমতি দিলেন। কেবল দু’খানা বড় কামরা তালাবদ্ধ রইলো আমাদের জন্য, শহরের মেহমানদের জন্য। নুরু মিয়ার অবস্থা দেখে আমার মামা ধান বিক্রি করে টাকা নেয়ার জন্য গ্রামে আসা ছেড়ে দিলেন। এখানকার ফসলে নুরু মিয়ারই চলে না। ওর স্ত্রীও পরিশ্রমী মেয়ে-সংসারী, কিন্তু এত পুত্র কন্যার জন্ম দিয়ে সে নাজেহাল, পঞ্চাশ বছর বয়স না হওয়া পর্যন্ত সন্তান উতপাদনের হাত হতে তার নিস্তার নেই। গ্রামাঞ্চলে সন্তান লালন পালনের তেমন বিশেষ কোন কাজ নেই। তাদের জন্য ভাত রান্না করাই প্রধান কাজ। অন্যান্য পরিচর্যা সবই প্রাকৃতিক। পরিষ্কার–পরিচ্ছন্ন রাখা , কাপড় চোপড় পরানো, আদব কায়দা সেখানো-এসবের বালাই নেই। সেজন্য প্রায়ই অসুখ-বিসুখে তারা পটল তলে। যারা আয়ু নিয়ে আসে, তারা যমের চোখে ধুলো দিয়ে কোনরকমে বেঁচেবর্তে থাকে। দিগম্বর একপাল ছেলেমেয়ে। কোমরে একটা মোটা কালো সুতায় তাগা বাঁধা, একরাশ তাবিজ গলায় ঝুলছে। ওই তাবিজই তাদের রক্ষা কবচ। যমদূত যেন বেশী কায়দা করতে না পারে, সেজন্য এত তাবিজ তারা সংগ্রহ করে মসজিদের ইমাম সাহেবের কাছ থেকে। তাতে ফল ভাল হয়। বেশীর ভাগ সন্তানই বেঁচে যায়। বাকীরা ঝরে পরে অকালেই। এভাবেই দিন যায়। নুরু মিয়া মাঝে মঝে শহরে আসে। মৌসুমের ফল, সবজি নিয়ে আসে। তারও বয়স বাড়ছে। সংসার বিশাল হচ্ছে। দায়িত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। সমস্যা জাল বিস্তার করছে। নুরু মিয়া সেই সমস্যার আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছে। কি শহরে, কি গ্রামে বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ঝামেলাও বাড়ে। জীবন নদী কোন বাঁকে মোড় ঘুরে তা কেউ জানে না।

শেষ পর্যন্ত শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে নুরু মিয়ার বারোটি সন্তান জীবিত রইলো। ছয়টি পুত্র, ছয়টি কন্যা। প্রথম সন্তানটি তার পুত্র। নাম জনাব আলী। বড় পরিশ্রমী, পিতার মতো। চাষবাসের কাজ ছেলেবেলা থাকেই করে, মনোযোগ সহকারে। এই ছেলেই বলতে গেলে নুরু মিয়ার দক্ষিণ হস্তের লাঠি। পুত্রদের মধ্যে দ্বিতীয়টি লাঠিয়াল। পেশীশক্তির চর্চা করে। খুব সাহসী। যেখানে দাংগা-হাংগামা, সেখানেই তার দলের ডাক পড়ে। তবে একেবারে বখে যায়নি। অন্য সময়ে সে ‘গিরস্তির’ কাজও করে।

..... চলবে

© লেখক

সম্পাদকীয়
পাঠক পরিষদের কথা
কবিতা
ছোট গল্প
রম্য রচনা
প্রবন্ধ
মুক্ত গদ্য
ধারাবাহিক
কল্প বিজ্ঞান
শিশুতোষ
ই-বুক
আর্কাইভ
লেখক পরিচিতি
যোগাযোগ
হোমপেজ

বোধ

হুমায়রা হারুন

১

রৌদ্র ঝলমল সকাল। আনমনে বাইরে তাকিয়ে আছে শীলা। সূর্য রশ্মির অসীম কৃপায় কিভাবে বেঁচে আছে এ জীবজগত আর এ মানব সভ্যতা, এসব কথা পড়াতে হবে আজকের ক্লাসে। কোয়ান্টাম তত্ত্ব। ফোটন কণিকার রহস্য ভেদ। বিজ্ঞানীরা যে ভাবে অগ্রসর হচ্ছেন তাতে বুঝি আর কোন রহস্যই অজানা থাকবে না। শীলা সেদিন খুব সহজেই ব্যাখ্যা করছিল খুব জটিল একটা জিনিস। প্রকৃতির নিয়মগুলো কিভাবে এত সুনিপুণ ভাবে পরিচালিত হচ্ছে ভেবে নিজের অজান্তেই নিজেকে সমর্পণ করেছিল প্রকৃতির কাছে। এই প্রকৃতিই হল বোধ, যার নিজের রয়েছে নিয়ন্ত্রণ করার অপার ক্ষমতা। যদি ধরে নেয়া যায় বিন্দুসম এক একটি আলোক কণা এক একটি বোধ, যাদের নিজেদেরই ক্ষমতা রয়েছে সিদ্ধান্ত গ্রহণের। ছাত্রদের মাঝ থেকে একটি প্রশ্ন এলো,

- যেমন?

শীলা বলল,

- একটি আলোক বিন্দু বহুদূর পথ পাড়ি দিয়ে এ পৃথিবীতে এসে পড়ছে। সেই সূর্যদেবতার আধারে জন্ম নিয়ে এই পথ পাড়ি দিয়েছে সে স্বীয় ইচ্ছায়। উদ্দেশ্য পৃথিবীতে যাবে। পৃথিবীর বুকে এসে এর তাপ, উষ্ণতা, আলো সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করবে। তাই স্বেচ্ছায় সে বরণ করেছে এই ভ্রমণ। চেষ্টা করবে পৃথিবীতে জীবনের স্পন্দন টিকিয়ে রাখতে। তার বোধ তাকে নিবেদিত করেছে এ লক্ষ্যে। তার এ অনুধাবন শক্তি এতটাই প্রখর যে সে জীবিতকে দান করে প্রাণ আর মৃতকে দান করে জীবন।

আবারো প্রশ্ন,

- সেই জীবন প্রদীপ নিভু নিভু এক দৃষ্টিহীন মানুষের কথা কি বলবেন, যাকে নিয়ে গবেষণার সূত্রপাত?

শীলা আগেও বলেছিল এ কথা তার ক্লাসে। লোকটি বেঁচে আছে তার চোখের অসাড় স্নায়ুগুলো নিয়ে দুই দশক ধরে। শীলা ভেবেছে ফোটন কণাগুলোর কথা। যদি তা হয় অফুরান প্রাণশক্তির আধার, তারাই কি পারে না এই মৃত স্নায়ুগুলোকে আবারো প্রাণবন্ত করে তুলতে? এ ভাবনা থেকেই যাত্রা শুরু ওর গবেষণার। প্রতিদিনই ঘন্টা দু'য়েক করে আলোক তরঙ্গ প্রবাহিত করে চোখের স্নায়ুগুলো পুনুরুজ্জীবিত করার চেষ্টা করে যাচ্ছে ও। কারণ আলোক তরঙ্গ বহন করছে একটি নয়, দু'টি নয়, অজস্র আলোক কণিকা। তারা প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র বোধে বলীয়ান। তারাই পারবে প্রাণহীন স্নায়ুকোষগুলো সজীব করে তুলতে। এই ব্যাখ্যায় তার লেকচার হয়ে উঠেছিল আরো বিস্ময়ের। ছাত্রদের মাঝ থেকে একটি প্রশ্ন ছিল বেশ ভাল।

- ফোটন কণিকার, সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা বর্জন করে, নির্দিষ্ট পথ পরিভ্রমণের ক্ষমতা যদি থেকেই থাকে তাহলে আমরা এই আস্ত বড় বড় মানুষগুলো সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছি কেন?

২

ল্যাবে সবচেয়ে সপ্রতিভ সহকর্মীর নাম জিসান। চিন্তাগুলো তার খুব ধারালো। আজ তার প্রশ্নটা ছিল বড্ড অদ্ভুত। প্রশ্নের সাথে তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মনে করিয়ে দেয় সে যেন সবকিছুই আগেভাগে জানে। গত মাসের রিসার্চের ফলাফল সম্বন্ধে ক্লাস লেকচারে সে এ নিয়ে অনেক কথা বলেছে। আজও জানতে চেয়েছে সেই অন্ধ লোকটির কথা। উত্তর দিতে গিয়ে শীলার শুধু মনে হয়েছে জিসান যেন এ রিসার্চের ফলাফলে অনেকটা আশাবাদী। জিসানের প্রশ্ন করার ভঙ্গী যেন উত্তরের প্রত্যাশায় নয় বরং ওকে যাচাই করার আশায়। মাঝে মাঝে ওর মনে হয় জিসান বুঝি মানুষ বেশধারী অন্য কোন জগত থেকে আসা আগুন্তুক, যারা কিনা সে জগতে অনেক বেশী প্রগতিশীল সভ্যতার ধারক। জিসান এ জগতে এ সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে তার সহকর্মী, তার গাইড। কিন্তু অন্য কোন জগতে হয়তো বা তার শিক্ষক। অন্তত জিসানের বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান দেখে শীলার অবচেতন মনে এটাই দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে গেঁথে গেছে।

৩

এখন গ্রীষ্মের ছুটি এসে পড়েছে প্রায় দুই মাসের। এই সময়টুকু শুধুই ল্যাবের কাজটুকু সেরে নিতে পারবে। এই সময়ে ক্লাসের তাড়া নেই। নিজের জন্য যথেষ্ট সময় নিয়েই বাসা থেকে বেরুলো। গাড়ির দরজার কাছে এসে চাবিটা বের করতেই মনে হল চাবিটা তো আনা হয়নি। আসলে আজ সকালে হাতের ধাক্কায় চাবিটা টেবিলের ওপর থেকে নীচে পড়ে গিয়েছিল। আলসেমি করে তখন আর তুলে রাখা হয়নি। আবার তাই ফিরে এলো ঘরে। চাবি, মানিব্যাগ, কয়েন আর টুকটাক কাগজপত্রগুলো অফিস হতে এসে টেবিলের প্রান্তে রাখে। ঘর ঢুকে দেখল সব কিছু ঠিকঠাক আছে, জায়গা মতো, এমনকি পড়ে যাওয়া চাবিটাও হয়তোবা টেবিলের তলায়। কিন্তু নাহ্, নেই তো ওখানে। পায়ের ধাক্কায় পাশের সোফার নীচে চলে গেল নাকি? কিন্তু তাও তো না। শীলা বুঝে উঠতে পারেনা মাঝে মাঝে কিভাবে তার সামনে থেকে জিনিসগুলো উধাও হয়ে যায়। ওকি ভুলোমন হয়ে যাচ্ছে আজকাল? নাকি বিশ্বাস করে নেবে চাবিটা অন্য কোন ডাইমেনশানে স্থানান্তরিত হয়ে গেছে। ফেরত না আসা পর্যন্ত তাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। এসব আজগুবি চিন্তা মাথায় নিয়ে হাত গুটিয়ে বসে থাকা তো সম্ভব নয়। অফিসে যেতে হবে। তারপর ল্যাব ওয়ার্ক। আর সময় নেই হাতে। ঝটপট একটা ট্যাক্সি ডেকে অফিসে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল।

৪
অন্ধ রোগীটি জন্ম থেকে অন্ধ নয়। সময়ের সাথে সাথে অন্ধত্বকে বরণ করে নিতে হয়েছে। নিয়তি। কিন্তু কদিন ধরে খেয়াল করছে ওর দৃষ্টির কিছুটা পরিবর্তন। কেউ সামনে দাঁড়ালে সে দেখতে পায় আবছা ছায়া। ডাক্তার, নার্সরা এতেই খুশী। তার স্নায়ুতে প্রেরিত আলোর কণাগুলো যেন এক একটা সৈনিক। আসাড় কোষগুলোকে উজ্জীবিত করার চেষ্টায় তারা সংগ্রামরত। সফল হতে পারলে এ চিকিতসা যুগান্তকারী সাফল্য আনবে চিকিতসা বিজ্ঞানে। এসব ভাবতে ভাবতে শীলা করিডোরে মুখোমুখি হল জিসানের।
-কিভাবে এলে? জিসানের প্রশ্ন। যেন জেনেই বলছে আজ ওর চাবিটা খোয়া গেছে।
বেশ অবাক হয়েই শীলা বলল, গাড়িতে তো নয়, বাসে।
জিসানের দ্বিতীয় প্রশ্ন, চাবিটা কি হারিয়ে গেছে?
শীলা এবার হেসেই ফেললো। বললো, তুমি জানলে কিভাবে?
জিসান এবার বেশ স্থির গলায় বললো, তোমার রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যাবে।
-তাই ভাব?
-না ভাবি না। এটাই নিয়ম।
-নিয়ম মানে?
-সব কিছুরই বোধ আছে এ জগতে। কম হোক আর বেশী হোক। এই বোধগুলো সকলেই তাদের নিয়ম পালন করতে চায়, দায়িত্ব সম্পূর্ণ করতে চায়। ব্যাতিক্রম শুধু তোমাদের গ্রহের মানুষগুলো।
এবার শীলার ধাক্কা খাবার জোগাড়।
-আমাদের গ্রহ মানে? এ গ্রহ কি তোমার নয় জিসান?
জিসান আর কোন কথা বললো না। আজ একটি বিশেষ দিন। আজ জিসান চলে যাবে অন্য কোথাও। এই স্পেইস-টাইম থেকে অন্য কোথাও। শীলাকে জানাবে না তা। ওর যে বড্ড মন খারাপ হবে। শীলার কাজ দেখার জন্যই জিসান এসেছিল এই স্পেইস-টাইমে । পৌছে দিয়েছিল একটি কি-ওয়ার্ড ওর মনোজগতে।
বোধ। যা থেকে পরবর্তীতে শীলার এ গবেষণার শুরু। এই শুরু একদিন এ গ্রহের মানুষদের অমরত্ব দান করবে। জিসানের দায়িত্বটুকু তাই আজ শেষ। এখনই ওর যাবার সময়, এখান হতে অনেক দূরে।

৫
সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত প্রায়। ল্যাব থেকে বেরিয়ে বাড়ি অভিমুখে রওনা দিল শীলা । বেশ ক্লান্ত সারাদিনের পর। ঘরে এসে আলো জ্বালালো। প্রথমেই চোখে পড়লো গাড়ির চাবিটা। কেউ যেন সযত্নে রেখে গেছে টেবিলের ওপরে। হঠাতই ফোন বেজে উঠলো। এত রাতে! আলসেমি লাগছে খুব, তাই ফোনটা ধরলো না। মেসেজ মেশিনে চলে গেছে ইনকামিং কল। জিসানের কন্ঠস্বর।
-ভাল থেকো শীলা। চাবিটা খুঁজে পেয়েছ এতক্ষণে? কাল আর ঝামেলা হবে না ল্যাবে আসতে। আমি যদিও কাল হতে ল্যাবে আর আসবোনা। আমার যে যেতে হবে এবার। লং ট্যুরে।

~~মন্ট্রিয়ল~~
০৪.০৪.০৯

Share on Facebook

সম্পাদকীয়
পাঠক পরিষদের কথা
কবিতা
ছোট গল্প
রম্য রচনা
প্রবন্ধ
মুক্ত গদ্য
ধারাবাহিক
কল্প বিজ্ঞান
শিশুতোষ
ই-বুক
আর্কাইভ
লেখক পরিচিতি
যোগাযোগ
হোমপেজ

পরীর দেশে খোকন

ফিরোজা হারুন

‘খোকন সোনা চাঁদের কণা এক রত্তি ছেলে, আর কিছু ধন চায় না খোকন মায়ের কোলটি পেলে।’ মায়ের কোলে শুয়ে শুয়ে খোকন বায়না ধরে সেই গল্পটি শোনার জন্যে। গল্প না শুনলে তার ঘুম আসে না। চার বছর বয়স হতে চললো খোকনের। ছোট্ট আদুরে চেহারা। দেখলে মায়া হয়। বেশীর ভাগ সময় তার মায়ের সঙ্গেই কাটে। মা তাকে ঘুম পাড়ানো ছড়া শোনান। তারপর বলেন সেই লাল পরীর গল্প।

এক দেশে এক রাজা ছিল। তার ছিল একটি সুন্দর ফুটফুটে মেয়ে। তার বয়সও চার বছর। সে হাসলে মানিক ঝরতো। কাঁদলে চোখের পানির ফোঁটা মুক্তা হয়ে যেত। তার পায়ে ছিল সোনার নূপুর। হাঁটার সময় মিষ্টি শব্দ হত। সেই শব্দে রাজপূরীর সবাই খুশী হত। সেই রাজকন্যার নাম ছিল চম্পা। রাজার বাড়িতে

ছিল বিরাট ফুলের বাগান। রাজ্যের যত ফুল ঐ বাগানে ফুটতো। বাগানের জন্য ছিল শত শত মালী। তারা সারাদিন বাগানে কাজ করতো। ফুলের গাছের যত্নই আসল কথা। আগাছা পরিষ্কার করা পনি দেওয়া, সময়মত সার দেওয়া, সব কাজ মালীরা করতো। বাগানে ছিল মার্বেল পাথরে বাঁধানো রাস্তা। এই রাস্তা দিয়ে হেঁটে ঘুরে বেড়ানো যেত সারা বাগানময়। মাঝখানে ছিল একটি ছোট্ট হ্রদ। তারও চারিধার পাথরে বাঁধানো। চতুর্দিকে বসার জায়গা। জোতস্না রাতে বাগানটি অপূর্ব সুন্দর দেখায়।

বাগানে পূর্ণিমা রাতে পরীরা বেড়াতে আসে। লাল পরী, নীল পরী, হলুদ পরী, সাদা পরী তাদের নাম। নাচের পোশাক পরে তারা, গলায় পরে ফুলের মালা। সারা শরীরে মনি মুক্তার গহনা, পায়ে সোনার ঝুমুর। হাতে ফুলের সাজি। পরীরা ফুল খুব ভালবাসে। ফুল যেমন সুন্দর, পরীরা তেমন সুন্দর। তারা নেচে নেচে ফুল তুলে আর সাজি ভরে। তাদের নাচের আওয়াজের তালে তালে চারিদিক হয় মুখরিত। সে শব্দ কিন্তু সবাই শুনতে পায় না। কেবল রাজকন্যা চম্পা আর তার মা-রাণী মা শুনতে পান। তেমনি এক পূর্ণিমা তিথিতে রাজকন্যা বাগানে গেল তার মায়ের সঙ্গে। পরীরা ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে এলো। পরীরা থাকে কুকাফ পাহাড়ে। বিশাল বাগানে এসে ছুটোছুটি শুরু করে দিল তারা। ফুলে ফুলে সাজি সাজি ভরে ফেললো। ফুলের সাজি বাঁধানো শ্বেত শুভ্র চত্বরে রেখে শুরু করলো নাচ। এমন সময় রাজকন্যা চম্পার হলো আগমন। পরীরা চম্পাকে কোলে তুলে নিল। চম্পাকে পেয়ে তারা মহাখুশী। নাচতে শুরু করলো ওকে সাথে করে। চম্পা পরীদের দেশে যেতে চাইলো। পরীরা চম্পার মাকে অনুরোধ করে চম্পাকে নিয়ে যাবার জন্য। রাণীমা বললেন, নিয়ে যাও। আবার দিয়ে যেও। দেরী করো না যেন। পরীরা চম্পাকে উড়িয়ে নিয়ে চলে গেল তাদের দেশে, সেই কুকাফ পাহাড়ে। সে এক সুন্দর দেশ।

সে দেশের সবুজ বনানী, দেখলে নয়ন জুড়িয়ে যায়। রকমারি ফুলের গাছ। ফুলের অন্ত নেই। ফুলের সুবাসে চারিদিক মৌ মৌ করছে। সবুজ নরম ঘাস। মখমলের মত। অনেক ফলের গাছ। মিষ্টি রসে ভরা সব ফল। পাখি আছে বিচিত্র বর্ণের। তাদের কলকাকলীতে পরীর রাজ্য মুখরিত। পাহাড়ের পাশে বয়ে চলেছে রূপালী নদী। রূপালী নদীতে ভেসে বেড়াচ্ছে সোনালী মাছেরা। পাহাড়ের গায়ে আছে ঝর্ণা। সুন্দরী ঝর্ণার পানি মিষ্টি। পরীরা চম্পাকে সব দেখালো। চম্পা মুগ্ধ হল। পরীরা তাকে অনেক উপহার দিল। হীরা, চুনী, পান্নার হার। সোনার থালা, রূপার গ্লাস। নয়ন ভোলানো পোশাক, প্রচুর ফুল। ঝুরি ভরে দিল অনেক সুমিষ্ট মেওয়া। তারপর লাল পরী, নীল পরী, হলুদ পরীÑসবাই মিলে চম্পাকে কোলে নিয়ে উড়ে চলে এলো রাজবাড়ির বাগানে। পরীরা চম্পাকে অনেক আদর করে বললো, চম্পা তুমি খুব মিষ্টি করে কথা বল। সকলকে ভালবাস। কাউকে দুঃখ দাওনা। বড় হয়েও তুমি যেন একরম ভাল থেকো।

পরদিন সকালে চম্পার ঘুম ভাঙ্গলো। সে তার মায়ের কোলে। সেদিন ছিল তার জন্মদিন। মা বললেন, শুভ জন্মদিন, চম্পামণি! জাগো, চোখ মেলো, চেয়ে দেখো, কি সুন্দর দিন আজ। আজ তোমার জন্মদিন। ছোট্ট রাজকন্যা চোখ মেলে চাইলো। দেখলো তার পালংক উপহারে ভরা। সেইসব উপহার যেগুলো পরীরা তাকে দিয়েছে। তার খুশী আর ধরে না। পালংক ছেড়ে সে নেমে এলো। আনন্দে নাচতে লাগলো। রাজা মহাশয়ও এলেন চম্পার ঘরে, তাকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানানোর জন্য। রাজা তার প্রিয় কন্যাকে আদর করে কোলে তুলে নিলেন। রাজপুরীতে আনন্দের বান এলো। সেই আনন্দের ধারা দেশের সকলের ঘরে ঘরে পৌঁছে গেল। রাজকন্যার মনে পড়তে লাগলো পরীদের শেষ কথাগুলো কারও মনে দুঃখ দিও না.....।

মায়ের কাছে চম্পার গল্প শুনে শুনে খোকন সোনা কল্পনার পাখা মেলে দিল। সেও রাজকন্যার সঙ্গে পরীদের রাজ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। পরীদের সঙ্গে নাচলো, গাইলো, সব কিছু দেখলো। উপহার নিল। লাল পরী, নীল পরীরা চম্পাকে যেসব প্রশংসা করলো সেগুলো তার মনেও গাঁথা হয়ে রইল। সেও বড় হয়ে চম্পার মত সবাইকে ভালবাসবে। কাউকে দুঃখ দিবে না। মায়ের গল্প বলা শেষ হলো। খোকন সোনার চোখের পাতায় ঘুম নেমে এলো। সে তার মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে, বুকে মাথা রেখে, পরম সুখে নিদ্রার কোলে ঢলে পড়লো।

পরদিন খোকন সোনার ঘুম ভাঙ্গলো মায়ের ডাকে। মা বললেন, শুভ জন্মদিন খোকা সোনা। জাগো, চেয়ে দেখ, তোমার জন্য কত উপহার। সত্যি খোকনের বিছানায় ছিল সুন্দর পোশাক, তার পছন্দের লাল-নীল-ঘুড়ি ছড়ার বই, খেলনা। মা আরো বললেন, কালো সাদা চান কপালে ছাগল ছানাটিও আজ থেকে তোমার। বাড়ির সবাই খোকনের ঘরে এলো জন্মদিনের আদর নিয়ে। ছোট ছেলেমেয়েরা খোকনের সঙ্গে আনন্দে মেতে উঠলো। দেখাদেখি ছাগল ছানাটিও তিড়িং-বিড়িং লাফতে লাগলো।

Share on Facebook

কার্তিকের কুয়াশা

কাব্য সঙ্কলন-আকাস রঙ স্বপ্ন (আবদুল হাকিম)

প্রবন্ধ সঙ্কলন-বাঙলা বানানে ভাইরাস (আবদুল হাকিম)

প্রশ্নবোধক-কাব্য সঙ্কলন (আবদুল হাকিম)

খালিল জিবরানের The Mad Man (অনুবাদ অবনি অনার্য)

মার্ক টোয়েন (অনুবাদ তিমুর)

আমার নৈঃশব্দ্য (কাব্য সংকলন - প্রণব আচার্য্য)

জীবনেরে কে রাখিতে পারে - উপন্যাস (ফিরোজা হারুন)

জবান বন্দি - উপন্যাস (ফিরোজা হারুন)

প্রতীক্ষা - উপন্যাস (ফিরোজা হারুন)

কাব্য সঙ্কলন - পাপ জেনেও স্পর্শ করি (সৈয়দ আফসার)

কাব্য সঙ্কলন - উড়াল হাওয়া (সৈয়দ আফসার)

Share on Facebook

সম্পাদকীয়

পাঠক পরিষদের কথা

কবিতা

ছোট গল্প

রম্য রচনা

প্রবন্ধ

মুক্ত গদ্য

ধারাবাহিক

কল্প বিজ্ঞান

শিশুতোষ

ই-বুক

আর্কাইভ

লেখক পরিচিতি

যোগাযোগ

হোমপেজ

কার্তিকের কুয়াশা

কার্তিকের কুয়াশা সাহিত্যপত্রের পুরনো সংখ্যা

নভো সংখ্যা -১

পূর্বপ্রকাশিত সাহিত্যপত্র 'নব আলোকে বাংলা'র পুরনো সংখ্যা

সাহিত্য পত্র - নব আলোকে বাংলা

নভো সংখ্যা -০

নভো সংখ্যা -১ নভো সংখ্যা -২ নভো সংখ্যা -৩ নভো সংখ্যা -৪

নভো সংখ্যা -৫

নভো সংখ্যা -৬ নভো সংখ্যা -৭ নভো সংখ্যা -৮ নভো সংখ্যা -৯

নভো সংখ্যা -১০ নভো সংখ্যা -১১ নভো সংখ্যা -১২

নভো সংখ্যা -১৩ নভো সংখ্যা -১৪

নভো সংখ্যা -১৫

নভো সংখ্যা -১৬ নভো সংখ্যা -১৭, নভো সংখ্যা -১৮ নভো সংখ্যা -১৯

নভো সংখ্যা -২০ নভো সংখ্যা -২১ নভো সংখ্যা -২২

নভো সংখ্যা -২৩ নভো সংখ্যা -২৪

নভো সংখ্যা -২৫

নভো সংখ্যা -২৬, নভো সংখ্যা -২৭ নভো সংখ্যা -২৮ নভো সংখ্যা -২৯

নভো সংখ্যা -৩০, নভো সংখ্যা -৩১

নভো সংখ্যা -৩২ নভো সংখ্যা -৩৩

সম্পাদকীয়

পাঠক পরিষদের কথা

কবিতা

ছোট গল্প

রম্য রচনা

প্রবন্ধ

মুক্ত গদ্য

ধারাবাহিক

কল্প বিজ্ঞান

শিশুতোষ

ই-বুক

আর্কাইভ

লেখক পরিচিতি

যোগাযোগ

হোমপেজ

সম্পাদকীয়
পাঠক পরিষদের কথা
কবিতা
ছোট গল্প
রম্য রচনা
প্রবন্ধ
মুক্ত গদ্য
ধারাবাহিক
কল্প বিজ্ঞান
শিশুতোষ
ই-বুক
আর্কাইভ
লেখক পরিচিতি
যোগাযোগ
হোমপেজ

ফিরোজা হারুন

জন্মঃ জানুয়ারি ১, ১৯৪৪, ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশাল থানার হরিরামপুর গ্রামে। স্নেহময় পিতা জনাব আব্দুস সোবহান বিশ্বাস ও মাতা জুবাইদা খাতুনের ছায়ায় বেড়ে ওঠা।শিক্ষাঃ ময়মনসিংহ বিদ্যাময়ী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়। তারপর টাঙ্গাইলের কুমুদিনী কলেজ হতে বি.এ. পাশ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে ইতিহাসে এম. এ. সমাপ্ত করে ময়মনসিংহ টিচার্স ট্রেনিং কলেজ ফর উইমেন থেকে বি. এড. ডিগ্রী অর্জন এবং ঢাকায় আদমজী ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুলে যোগদান।

এক কন্যা ও এক পুত্র সন্তানের জননী ফিরোজা হারুনের সাহিত্য অঙ্গনের অগ্রযাত্রার মূলে প্রেরণা যুগিয়েছে তাঁর স্বামী ডাঃ মোহাম্মদ হারুন। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'জীবনেরে কে রাখিতে পারে' সাপ্তাহিক রোববারে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশের পর ১৯৯৭ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। আর আন্তর্জালে প্রকাশ পেয়েছে ২০০৮ সালে। দ্বিতীয় প্রকাশিত উপন্যাস ২০০০ সালে 'সুখের লাগিয়া'। ২০০৮ এ প্রকাশিত হয়েছে আরো ছয়টি গ্রন্থ। কিশোর সংকলন -মেঘরাজা রোদরাজা, কাব্য সংকলন-নিশি লোর, উপন্যাস-প্রতীক্ষা, তিন পুরুষের গল্প, স্মৃতির দুয়ারে এবং গল্প ও প্রবন্ধ সংকলন-ছিন্ন বীণার তার।

লেখালেখির পাশাপাশি তিনি সমাজকল্যাণ মূলক কাজে নিয়োজিত রয়েছেন। প্রতিষ্ঠা করেছেন তাঁর মায়ের স্মৃতিস্মরণে একটি প্রাইমারি স্কুল তাঁরই নিজ গ্রামে।

****

আবদুল হাকিম

[লেখাটিতে ঈ, ঊ, ণ, ং, শ –এ পাঁচটি অক্ষর ব্যবহার করা হয়নি-আবদুল হাকিম]
সৈসব কেটেছে পিতার কর্মস্থল দেসের বিভিন্ন জায়গায়। স্কুল ও কলেজ জিবন জন্মস্থান মাগুরাতে। স্নাতকোত্তর ঢাকায়। ছাত্রজিবনে প্রথমে ছবি আঁকা,পরে নাটক,আবৃত্তি ও সাহিত্য চর্চা। ছবি আঁকা, নাটক ও আবৃত্তিতে পুরস্কার লাভ। সেই সুত্রে চলচ্চিত্র। চলচ্চিত্রকার আলমগির কবির পরিচালিত ঢাকা ফিল্ম ইনস্টিটিউট থেকে ১৯৭৪ সালে ফিল্ম এয়াপ্রিসিয়েসন কোর্স সমাপ্ত করে তাঁর কয়েকটি ছবিতে সহকারি হয়ে কাজ করার অভিজ্ঞতা।
প্রথম গ্রন্থ,ছোটদের জন্য লেখা কেমন করে স্বাধিন হলাম প্রকাসিত হয় ১৯৮৯ সালে। এরপর প্রথম উপন্যাস এখনো গর্ভে তোমার প্রকাসিত হয় ২০০০ সালে। ২০০১ সালে প্রকাসিত হয় দ্বিতিয় উপন্যাস তখন । তৃতিয় উপন্যাস কেন প্রকাসিত হয় ২০০২ সালে। কাব্য সঙ্কলন আকাস রঙ স্বপ্ন ও প্রবন্ধ সঙ্কলন বাঙলা বানানে ভাইরাস ইলেকট্রনিক সঙস্করনে প্রকাসিত হয় যথাক্রমে ২০০৭ ও ২০০৮ সালে।
আবদুল হাকিম বর্তমানে আমেরিকা প্রবাসি।

***

কোয়েল সাহা

নিঝুম দুপুর, সাঁঝের বেলায়
রাতদুপুরের মাতাল কালোয়ে
লিখছি আমি,একাকী
নীল সবুজের অবুঝ মিল

দর্শক আমি একাকী
পরিচিতির আরম্ভরে
নিরুদ্দেশে, একাকী
স্বচ্ছ সরল মনের
কথা জানাই ,আমি একাকী
নাম, কোয়েল, শুধুই কোয়েল
নদী আমি,নই পাখী।
***

পার্থসারাথি ভৌমিক

• আড়াই বছর বয়স থেকে ‘গোপামাসি'-র কাছে কবিতা আবৃত্তি শেখা । তখন থেকেই বিভিন্ন আবৃত্তির প্রতিযোগিতায় শংসাপত্র লাভ । কলকাতা থেকে কৃষ্ণনগর আর গরিফা থেকে বাংলাদেশ সীমান্তে – বনগাঁয় , কবিতা শোনাতে ছুটোছুটি । ১২ বছর বয়সে বেতার শিল্পীর পরিচয় । .....সেখান থেকে আস্তে আস্তে কিভাবে এক অবিচ্ছেদ্য ভালোবাসায় জড়িয়ে পড়া, কবিতার সাথে । তারপর একটু আধটু লিখতে চেষ্টা করা । প্রথম লিটল ম্যাগাজিনে ২০ বছর বয়সে আত্মপ্রকাশ। পেশায় মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার । এখন মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি , মিত্র এস কে -র বিজনেস ম্যানেজার এর ভূমিকায় । ব্রাঞ্চ, কর্নাটকের হস্পেট । আগামী জীবন কবিতা দিয়ে পরবর্তী প্রজন্মকে কিছু বলে যেতে চাই । আর অবশ্যই চাই সমাজের অন্যায় অবিচার কে রুখতে ।। ।

****

সাইফুজ্জামান

সাইফুজ্জামান কবি, সমালোচক ও গবেষক। জন্ম ১০ জানুয়ারী ১৯৬২, মাগুরা। শিক্ষা: বি এ অনার্স, এম এ (ইতিহাস), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
সাইফুজ্জামান ৮০'র দশক থেকে জাতীয় দৈনিকে নিয়মিত লেখালেখি করছেন। এক জেলা শহরে কৈশোর ও যৌবনের প্রথম ভাগ কেটেছে। পিতার কর্মসূত্রে বাংলাদেশের সর্বত্র ঘুরে বেড়িয়েছেন। সম্পাদনা করেছেন শব্দ, সংবর্ত, ট্র্যাপ, তুরুপ সাহিত্য কাগজ। আলস্য ও অভিমান থেকে কখনো লেখালেখি হতে দুরে সরে গিয়েছেন। আবার ফিরেও এসেছেন। অতৃপ্তি নিয়ে লিখছেন। সাইফুজ্জামান অপেক্ষায় আছেন ভালো লেখাটি তৈরী করার জন্যে। তিনি জাতীয় জাদুঘরের ইতিহাস ও ধ্রুপদী শিল্পকলা বিভাগে সহকারী কিপার হিসাবে কর্মরত রয়েছেন।

****

এ কে এম সাইদুজ্জামান

Diogenes the Cynic এর মতো ভাবতে ভালবাসি, "আমি এই পৃথিবীর নাগরিক।" অবাস্তব ভাবনা বৈকি? যুক্তরাষ্ট্র এবং ক্যানাডার বিভিন্ন শহরে, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা এবং সিভল এঞ্জিনিয়ারিং পেশায় আমি সর্বদাই সাময়িক এক কর্মজীবী। সর্বদা সাময়িক আর চিরস্থায়ী বস্তুত একই বস্তু বলে বোধ করি। জীবিকা অর্জনের তাগিদে সিভল এঞ্জিনিয়ারিংয়ের নিরস কর্মকান্ড আমার জীবনে এক স্থায়িত্ব দখল করে ফেলেছে। সেই যৌবন থেকে ভেবেছি মিস্তিরিগিরি সাময়িক দুএকটি বছর করে পাকাপোক্ত ভাবে সাহিত্য জগতে ঢুকে পড়ব - বাস্তব তা হতে দেয়নি।
আর সামান্য একটু বেশি সাহস থাকলে ভদ্র গোছের একজন লেখক হতে

পারতাম হয়তো। ১৯৭৯ সালে প্রথম লিখেছি, ১৯৮০-১৯৮১ তে একালের নামকরা লেখকদের সাথে সেকালে সাহিত্যের দারুন আড্ডা দিয়েছি - এই স্মৃতিটুকু সম্বল করেই এই বুড়ো বয়সে সাহিত্যের পথে আমার এই বিলম্বিত যাত্রার শুরু। আমার সাহিত্য রচনা যাঁরা পছন্দ করেছেন, কাকতালীয়ভাবেই তাঁদের অনেকেই জীবনের কোনো এক সময় নিদারুন মস্তিস্ক বিকৃতির প্রমান রেখেছেন, আর এ ব্যাপারটাও ফলত আমাকে বেশ নিরুতসাহিত করেছে। গোটা দুয়েক বই, ডজন খানেক রচনা আমার ছাপা হয়েছে - তবে তা সাহিত্যের নয়, বাংলা ভাষায়ও নয়। ইংরেজি এবং রুশ ভাষায় লেখা ওই রচনাগুলো।
গোটা চারেক ছোট গল্প বাংলায় লিখিয়ে নিয়েছে আমার বন্ধুরা, তা ছাপানোর ব্যবস্থাও তাঁরাই করেছেন। পাঠকদের কেউ কেউ আবেগে মন্তব্য করেছেন সব কটি লেখাই নাকি শ্রেষ্ঠ। এরকম মন্তব্য আমাকে নিরুতসাহিতই করেছে এতকাল। যদি সত্যিই আমার লেখাগুলো ভালো হয়ে থাকে তবে হয়তো পঞ্চম লেখাটি আর সেরকম ভালো হবে না।
১। কেন লিখি? পাঠকের অনুরোধের ঢেকি গিলি।
২। আমার প্রিয় লেখক - বাংলা সাহিত্যে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, রচনা "কাগজের বউ"; ইংরেজি সাহিত্যে ফিলিপ রথ, রচনা "দ্য ডায়িং এনিম্যাল"; রুশ সাহিত্যে ইভান বুনিন, রচনা "ভালোবাসার ব্যাকরণ (грамматика любви)"। আমি নিজে খুবই খারাপ ধরনের পাঠক - কোনো রচনার বিষয়, কাঠামো, কৌশল, শব্দ নির্বাচন আমার মনে না ধরলে পড়তে ইচ্ছে করে না তা সে যত বড় লেখকের রচনাই হোক না কেন।
৩। ইন্টারনেট বাংলা সাহিত্যকে অবশ্যই উন্নতির শিখরে পৌঁছে দেবে বলেই আমি বিশ্বাস করি। পাঠকের বিবেচনা শক্তি বাড়বে, ভালো লেখার ক্ষুধা-তেষ্টা বাড়বে - সৃষ্টি বাড়তে বাধ্য যখন তার প্রয়োজন তীব্র হতে থাকে।
৪। বাংলা সাহিত্যের অতীত এবং ভবিষ্যত দু'কালই মারাত্মক উজ্জ্বল। বর্তমান কালটাই শুধু একটু বেশি সময় নিচ্ছে ভবিষ্যতের প্রস্তুতি নিতে।
৫। যে লেখক ভালো লিখতে পারেন তিনি বাধ্য লিখতে। না লিখলে তার শাস্তি হওয়া উচিত, হয়ও বটে। যে লেখক ভালো লিখতে পারেন না, তার উচিত লেখার লোভ সামলানো। বাংলা সাহিত্যে অধুনা নামকরা অনেক লেখকের স্থানে আমি থাকলে লেখালেখি স্থায়ী ভাবে বাদ দিয়ে দিতাম। বড় পাপ হয় যা তা লিখে পাঠকের হাতে দিলে, বড় পাপ হয় সাহিত্য, বিজ্ঞান বা প্রকৌশলকে শুধুই ব্যবসায় পরিণত করলে।
৬। বর্তমান প্রজন্মের কাছে আমার প্রত্যাশা? বর্তমান প্রজন্মকে আরও একটু স্থির, আরো একটু বিবেচক, আরো একটু প্রশিক্ষিত দেখতে পেলে ভালো লাগতো।
৭। একদিন লেখক হবার স্বপ্ন দেখেছিলাম - হতে পারিনি। অন্য অনেক কিছু লিখে লিখে জীবন কেটে গেলো, সাহিত্যের লেখা হলো না - হবে না - হয়তো যোগ্য নই।

****

সাগর জামান

শৈশবে অগ্রজদের সাহিত্য চর্চায় অনুপ্রাণিত হয়ে এই আগুনে হাত পোড়ানোর সুত্রপাত। স্কুল জীবন থেকে লেখালেখির সূচনা । সম্পাদনা করেছি ‘আলোকের এই ঝর্ণাতলে’, ‘অমল ধবল দিন’, ‘ফিরে আসি মাটির টানে’, ‘নীল আকাশ সোনালী রৌদ্র’ প্রভৃতি সাহিত্য কাগজ। বাংলাদেশের সব শীর্ষ লেখকদের পাশাপাশি নতুনদের লেখা স্থান পেয়েছে এসব সাহিত্য কাগজে। নব্বই দশক থেকে বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকাগলো যেমন প্রথম আলো, ভোরের কাগজ, আজকের কাগজ, যায় যায় দিন, বাংলাবাজার পত্রিকা,জনকন্ঠে লেখালেখি করছি।
রোদ্দুরময়ী প্রতাপে পুড়ে যায় মনণশীলতার প্রান্তর। রোদ্দুর আগ্রাসী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। প্রতিদিন বিনষ্ট হয় হৃদয় কোমলতা। অপ্রকৃতস্থ রাজনীতি, অস্থির বিশ্ব, দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি আমাদের যাপিত জীবনে বিরূপ প্রভাব বিস্তার করে। এই বিপর্যস্ততার মধ্যেও সৃষ্টি সুখের উল্লাসে নিজেদেরকে আবিষ্কার করার প্রাণান্ত চেষ্টা। সে কারণে হয়তো কার্তিকের অমল কুয়াশা ধারায় অবগাহনের মোহন উদ্দেশ্যে মিলিত হওয়া। এই মহা মিলন নিশ্চয়ই আমাদের আনন্দ বেদনার সহজ ভাগাভাগির সহায়ক হবে। দেখা হবে সৃজনশীলতার মধ্যে।

***

শুভেন্দু দেবনাথ

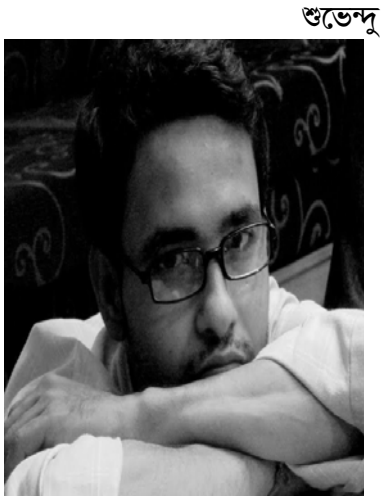

নাম শুভেন্দু দেবনাথ, জন্ম ১৯৮৩ সালের ১৪ই এপ্রিল হুগলী জেলার চুঁচুড়াতে। পেশায় কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার, বর্তমানে কর্ম সুত্রে দিল্লী প্রবাসী। লেখা শুরু ঠাকুরদার অনুপ্রেরনায়।ঠাকুরদা বিখ্যাত নাট্যব্যক্তিত্ব রঞ্জন দেবনাথ অরফে অগ্রদূত। স্কুলের শিক্ষা শেষ করে দিল্লী চলে আসা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে এবং এখানেই চাকরিতে যোগদান। নেশা ঘুরে বেড়ানো, বই পড়া, ছবি তোলা আর কবিতা লেখা। সময় সুযোগ পেলেই আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে কারণ আদিবাসীদের জীবন আমাকে টানে। অদের মধ্যে থেকেই খুঁজে পাই জীবনের মানে।

***

অরুণোদয় কুণ্ডু

লেখক পরিচয় – নাম অরুণোদয়। ধাম হাওড়া , পশ্চিমবঙ্গ , ভারতবর্ষ আর কাম প্রযুক্তিবিদ্যার ছাত্রগিরি । এখন প্রশ্ন আসে সাহিত্যে আমার কাম কি? কাম নেই আছে ভালবাসা , ছোটবেলা থেকে। জীবনটা নদীর মত বয়ে যায়, তার কর্মমুখর পথের দুধারে অববাহিকার শস্য শ্যামল সাহিত্য তার সবুজ রঙ্গিন হাত দিয়ে জড়িয়ে রয়েছে আমার হৃদয়। সেই সবুজের পূজা ই আমার সাহিত্য । কখনো তা ভোরের গৈরিক রঙে ত্যাগ মন্ত্রে দীক্ষা ; কখনো বিকেলের কনে দেখা রোদে ঘরে ফেরার গান । কখনো প্রতিজ্ঞা ,কখনো হাসি কখনোবা অভিমান ।কখনোবা তা বীরমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে মানবাত্মার কল্যানের খোঁজে ফেরার । এসব নিয়েই আমার সাথে সাহিত্যের জমজমাট প্রেম । তার সাক্ষাতকারের সাক্ষী হতে বারন নেই কারোর। তাইতো সে আজ “কার্তিকের কুয়াশা” এর দরবারে , একমুঠো দমকা হাওয়ার ভালবাসা নিয়ে।

***

বেদানুজ চক্রবর্তী

জন্ম পশ্চিমবঙ্গের হুগলীতে। শৈশবে মায়ের মুখের গল্প আর গান সাহিত্যের জগতে প্রবেশের চাবিকাঠি । লিটল ম্যাগাজিনে আত্মপ্রকাশ আঠারো বছর বয়সে। অনুরাগী পাঠক। আবৃত্তিকার। ভালবাসেন রবীন্দ্রনাথের গান। হাতে খড়ি পদার্থবিদ্যায়। বর্তমানে ভারতীয় স্টেটব্যাঙ্কে কর্মরত।
“ Art for Art’s sake “ এই মতাদর্শের পাশাপাশি বিশ্বাস করেন মানবধর্মে । সাহিত্য সে ধর্মে উত্তরণে সহায়ক বলেই লেখক মনে করেন।

Share on Facebook

কার্তিকের কুয়াশা

editor@kartiker-kuasha.nauba-aloke-bangla.com

সম্পাদকীয়

পাঠক পরিষদের কথা

কবিতা

ছোট গল্প

রম্য রচনা

প্রবন্ধ

মুক্ত গদ্য

ধারাবাহিক

কল্প বিজ্ঞান

শিশুতোষ

ই-বুক

আর্কাইভ

লেখক পরিচিতি

যোগাযোগ

হোমপেজ